

ড. রাগিব সারজানী

শিয়া মতবাদ ধারণা ও বাস্তবতা

আল-আমিন ফেরদৌস



ড. রাগিব সারজানী

শীয়া মতবাদ : ধারণা ও বাস্তবতা

আল-আমিন ফেরদৌস

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

শীয়া মতবাদ : ধারণা ও বাস্তবতা

মূল	ড. রাগিব সারজানী
ভাষান্তর	আল-আমিন ফেরদৌস
দ্বিতীয় সংস্করণ	একুশে বইমেলা ২০২১
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০২০
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৪০.০০ (দুইশ চল্লিশ টাকা) মাত্র

SHIA MOTOBAD : DHARONA O BASTOBOTA

Writer D. Rag:b al-hanafi as-sarjani

Marketed & Published by Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 240.00, US $ 08.00 only.

ISBN : 978-984-93855-7-8

E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

শ্রদ্ধেয় দাদুভাই

মরহুম আবদুল গফুর খান।

ছেলের প্রতি নাতির ব্যাপারে যার সর্বশেষ নির্দেশনা ছিল,
'এবার গিয়েই আল-আমিনকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিবা;
দেরি যেন না-হয়।'

এর কিছুদিন পরই দাদুভাই আমাদের ছেড়ে না-ফেরার দেশে পারি
জমান। তার আর জানার সুযোগ হয়নি, তার আদরের ছোট্ট সে নাতি
আজ কত বড়ো হয়েছে, দীনি শিক্ষার কতগুলো ধাপ অতিক্রম করেছে;
এমনকি লিখছেও সামান্য!

যে দাদুভাই ছেলেবেলায় আমার সামান্য সফলতার গল্প শুনে অসামান্য
খুশি হতেন, অনেক অনেক দোয়া করতেন;
সে-দাদুভাই আজ এ সংবাদ শুনে না জানি কত বেশি খুশি হতেন,
কত বেশি দোয়া করতেন।

দাদুভাই সহজ, সরল, নামাযী এবং পরোপকারী মানুষ হিসেবে সকলের
ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। আল্লাহর কাছেও তিনি ভালো ছিলেন বলেই
আমার ধারণা। দয়াময় যেন এ ওসিলায় আমার দাদুভাইকে মাগফিরাত
নসিব করেন—এ-ই কামনা।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার; দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী-তাবেয়ী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল একনিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর। পরকথা...

আমরা সাধারণত দেখি, একটি বইয়ে অনিচ্ছাকৃত রয়ে যাওয়া ছোটো-বড়ো সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করতে চেষ্টা করা হয়। আমরা এ-ও দেখে থাকি, একাধিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন কারণে একই বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠান থেকে একই বইয়ের একাধিক অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে, এমনটি বোধহয় কখনো হয়নি।

কিন্তু রাহনুমা প্রকাশনী এই প্রথম সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে একটি অনূদিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ পাল্টে দেওয়ার মতো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, রাহনুমার এ সিদ্ধান্ত প্রকাশনা জগতে তাদের দূরদর্শিতা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা এবং পাঠকদের প্রতি আন্তরিকতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং এটি অন্যদের জন্য 'রাহনুমায়ী' হবে, ইনশা-আল্লাহ!

কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই স্বীকার করছি, একজন নবীন অনুবাদক হিসেবে এমন একটি 'চ্যালেঞ্জিং' কাজের জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না; যোগ্য তো নই-ই। তবুও নিতান্তই সুধারণাবশত রাহনুমার পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন প্রতিভাবান তরুণ কবি, লেখক ও সম্পাদক বন্ধুবর নেসারুদ্দীন রুম্মান। কিন্তু আমার জানা নেই, আমার প্রতি তার সেই সুধারণা গ্রন্থটি হাতে পাওয়ার পর কতটুকু বাকি থাকবে; জানি না, পাঠকরাই-বা এ অধমকে কীভাবে দেখবেন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখছি, আগাগোড়া নতুন এ সংস্করণে বেশকিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন : অনিচ্ছাকৃত ছুটে যাওয়া অংশ যোগ করা হয়েছে, অনুবাদের অসঙ্গতি দূর করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, স্থান ও সংগঠনের নামের বানানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে, অধিকাংশ সংগঠনের নামের আরবী ও ইংরেজি অনুবাদ যোগ করা হয়েছে, যাতে এ শব্দমালা ধরে একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিস্তারিত পাঠের দিকে আগাতে পারেন। তা ছাড়া, প্রয়োজনে ছোটো ছোটো টীকাও যোগ করা হয়েছে। আশা করি, এ সংযোজনগুলো দীনি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকদের জন্যও উপকারী হবে।

সাধারণত বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আরবী শব্দের ক্ষেত্রে মূল শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে 'ঈ-কার' ব্যবহৃত হয়েছে। আর ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, স্থান ও সংগঠনের নামের বানানে 'মাকতাবা শামেলা' ও ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যসূত্র, বিশেষত 'উইকিপিডিয়া'র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে সহজবোধ্য হওয়া, অধিক প্রচলিত হওয়া এবং মূলের কাছাকাছি থাকার মতো বিষয়গুলো।

অনুবাদে 'সুন্নী' শব্দটি নিয়ে দুটি কথা বলে রাখছি—এ গ্রন্থে 'সুন্নী' শব্দটি মূলত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অর্থে; আরও সহজ কথায় 'শিয়া' শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সুন্নী শব্দটি এখানে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রতিনিধি ও অনুসারীদের বোঝাতেই এসেছে; অভূতপূর্ব কোনো দল কিংবা গোষ্ঠী বোঝাতে নয়।

বলার জন্য নয়, মন থেকেই বলছি—এ কাজটি নিঃসন্দেহে আমার জন্য অনেক বড়ো একটি জিম্মাদারি ছিল। জানি না, সে জিম্মাদারি আমি কতটুকু পালন করতে পেরেছি। হয়তো আমারও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে; এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ত্রুটিগুলো যেন

অমার্জনীয় না হয়, এই কামনা করি দয়াময়ের কাছে। আর পাঠকদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ করি, আপনাদের মনে জাগা যে-কোনো অসঙ্গতি আমাকে জানাবেন মেহেরবানি করে: তাতে আমি সীমাহীন উপকৃত হব: আপনাদের প্রতিও হব চিরকৃতজ্ঞ।

আমার এ কলম-সফরে যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, তাদের সকলের জন্য দিল থেকে রইল অনেক অনেক দোয়া: বিশেষত, সুলতান আবদুর রহমান এবং ফয়জুল্লাহ যথাক্রমে সম্পাদনা ও অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছে, প্রিয় সহপাঠী ও বন্ধুবর এ দুজনের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী—যার বিরামহীন উৎসাহ প্রদান, আগ্রহভরে 'কতটুকু হলো' জানতে চাওয়া এবং যে-কোনো প্রয়োজনে ছায়ার মতো পাশে পাওয়া—নিঃসন্দেহে সুখের—তাকেও জানাই অশেষ শুকরিয়া। আল্লাহ তাঁর এ আবিদাকে যেন উপযুক্ত বিনিময় দান করেন।

সবশেষে এই আশা ব্যক্ত করেছি যে, এ গ্রন্থটি পাঠকের সামনে শিয়া সম্প্রদায় নিয়ে ভাবনার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করবে: শিয়াদের সম্পর্কে আরও কিছু জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে: বলতে বাধ্য করবে, 'ধারণা আর বাস্তবতা অনেকাংশেই এক নয়'। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেহনতকে কবুল করে নেন। এ গ্রন্থটিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী করে দেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আল-আমিন ফেরদৌস

করটিয়া, টাঙ্গাইল

ভূমিকা

উসূলবিদ আলেমগণ বলেন, 'কোনো বিষয়ে কারও প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে তার ভাবনারই অংশ।' অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আমি ঠিক তখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হব, যখন সে বিষয়ে আমার পর্যাপ্ত জানাশোনা থাকবে এবং সেটি আদ্যোপান্ত আমার আয়ত্তে আসবে।

এজন্য শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে না জেনে কিছু বলে ফেলা, শিয়া ও সুন্নীদের নীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত না হয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণে নেমে পড়া অনর্থক, মূল্যহীন।

সুতরাং, আপনি যদি শিয়াদের প্রকৃত বাস্তবতা, ভালো-মন্দের অবস্থা এবং মুসলিম উম্মাহর নীতি ও আদর্শ-বহির্ভূত কাজের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে অবগত না হন, তাহলে এ বিষয়ে আপনার কোনো আলোচনা বা সমালোচনা গ্রহণ কিংবা বর্জনের প্রশ্নই উঠবে না।

শিয়া মতাদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে চেষ্টা করব; সেগুলো হলো : শিয়া কারা? কী তাদের ভিত্তিমূল? তাদের আকীদাগত এবং ফিকহ-সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটই-বা কী? কী তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাস্তবতা? কী তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন আমাদের জানা থাকবে তখন আমরা সুদৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারব। এমন কতজনই তো আছেন, যাদের কাছে সঠিক তথ্য ও বিশুদ্ধ চেতনা পৌঁছামাত্রই তা সাদরে গ্রহণ করে নেন, পূর্ব-সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নিঃসংকোচে।

বলে রাখা ভালো, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রসঙ্গত এমন কিছু বিষয় আলোচনায় উঠে আসবে, যেসব বিষয় এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে চাইলেও সম্ভব ছিল না। যেমন: 'লেবাননের হিযবুল্লাহ', 'ইরানের শাসনব্যবস্থা', 'ইরান-আমেরিকা বাদানুবাদ', 'ইয়েমেনের হুথি সম্প্রদায়' ইত্যাদি।

সংবাদপত্র খুললেই এসব বিষয়ে নানান খবরাখবর আমাদের চোখে পড়ে; কিন্তু শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে বিষয়গুলো কীভাবে দেখা দরকার, তা হয়তো বুঝে উঠতে পারি না। তাই এ প্রসঙ্গে রচিত আমার কিছু প্রবন্ধ ছোট্ট এ গ্রন্থে মলাটবদ্ধ করতে চেয়েছি; এই কামনায় যে, পাঠক এক নিমিষেই এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ জেনে ফেলতে পারেন।

সন্দেহের অবকাশ নেই, বিষয়টি প্রচুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে; তাই, এই সুবাদে অচিরেই তেমন কিছু পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে চাই; ইনশা-আল্লাহ, শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আমার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *কিসসাতুশ শিয়া* অচিরেই প্রকাশিত হবে।

সবই দয়াময়ের দয়ার ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সঠিক পথের দিশারি।

ড. রাগিব সারজানী

সূচিপত্র

শীয়া মতবাদ : ধারণা ও বাস্তবতা

শিয়াদের গোড়ার কথা

'একটি মতাদর্শ কখনই নির্দিষ্ট কোনো দেশ ও জাতির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না; সাধারণত এর কিছু-না-কিছু প্রতিক্রিয়া থেকেই থাকে, যা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী দেশ ও জনপদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণে প্রতিটি মতাদর্শের ভিত্তিমূলে থাকে বিশ্বাসগত, ফিকহ-সংক্রান্ত ও ইতিহাস-সম্পৃক্ত বিষয়-আশয়। কোনো মতাদর্শের যথাযথ উপলব্ধি নির্ভর করে এসব জানার ওপর।'

শিয়া মতবাদের সূচনা কখন, কীভাবে হয়েছিল তা নিয়ে ইতিহাসজ্ঞদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে; শোনা যায়, হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মাঝে বিরোধ চলাকালে যারা হযরত আলীর পক্ষ নিয়েছিল তারা শিয়া; আর যারা বিপক্ষে ছিল তারা সুন্নী। সহজ কথায় হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমার অনুসারীরাই যথাক্রমে শিয়া ও সুন্নী। কিন্তু বিজ্ঞ কেউ কখনো এমন দাবি করেননি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা অনুযায়ী হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন প্রথম সারির সাহাবী। তাঁদের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে হযরত আলী যে সিদ্ধান্ত নেন, তা ছিল যথাযথ; পক্ষান্তরে হযরত মুয়াবিয়ার 'ইজতিহাদ' এ ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না।

এ থেকে হযরত আলীর পক্ষে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর স্পষ্ট সমর্থন প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া বর্তমান সময়ের অধিকাংশ শিয়া যে বিশ্বাস ও সংস্কৃতি মনে-প্রাণে লালন ও পালন করে, তা কোনোভাবেই হযরত আলীর জীবনাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্য 'হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগেই শিয়া মতবাদের উৎপত্তি' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিহাসবেত্তাদের অনেকে বলেন, শিয়া মতবাদের উৎপত্তি ঘটে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত-পরবর্তী সময়ে। এ মতটি তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ, হযরত হুসাইন যখন ইয়াযিদের খেলাফত অস্বীকার করেন তখন ইরাকের কিছু লোক তাঁকে সমর্থন জানায় এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরাকে আহ্বান করে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রথমদিকে তারা তাঁকে সঙ্গ দিলেও শেষ পর্যায়ে গিয়ে পিঠটান দেয়। যার ফলে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে ইরাকীরা যারপরনাই লজ্জিত হয়, পাপবোধে জর্জরিত হতে থাকে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একপর্যায়ে তারা উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়; সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে সংঘর্ষে তাদের অনেকেই প্রাণ হারায়। এই সুবাদে বিদ্রোহীদের উদ্দেশে ইতিহাসে প্রথমবার 'শিয়া'[১] শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এ থেকে আরও প্রমাণিত হয়, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে তাঁর পুত্র হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গেই শিয়াদের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। এজন্যই হয়তো বর্তমান শিয়ারা হযরত হুসাইনের শাহাদাত-বার্ষিকী খুব জাঁকজমকভাবে পালন করে, অথচ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা তারা স্মরণেই আনে না।

সর্বোপরি এ মতাদর্শের সূচনা হয়েছিল নিছক একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণ করা; খলীফার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করবে তাদের সাহায্য করা। এমনকি প্রথম দিকে তাদের আকীদাগত নীতি এবং ফিকহ-সংক্রান্ত বিধির কোনোটিই আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল না। উপরন্তু, শিয়াদের কাছে যারা প্রথম সারির ইমাম তারা সকলেই ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পরিপূর্ণ অনুসারী।

---

১. দলছুট সম্প্রদায়।

হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কয়েক মাস পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়; কিন্তু তাঁর ছেলে আলী যাইনুল আবিদীন রহিমাহুল্লাহর সময়ে আবার তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব; দুনিয়াবিমুখ আলেম হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু কখনই শোনা যায়নি, যা সাহাবী ও তাবেয়ীদের আকীদা ও চিন্তাধারার পরিপন্থি।

আলী যাইনুল আবিদীনের ঘরেও দুজন মনীষীর জন্ম হয়। যাদের তাকওয়া ও পরহেযগারিতা ছিল সুউচ্চ; তারা হলেন—হযরত মুহাম্মদ আল-বাকির এবং হযরত যায়েদ রহিমাহুমাল্লাহ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর তৎকালীন মুখপাত্র—সাহাবী ও তাবেয়ীদের সঙ্গে তাদের কোনো দ্বিমত বা বিরোধ ছিল বলে জানা যায় না। তবে হ্যাঁ, একটি বিষয়ে হযরত যায়েদ ইবনু আলী রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিগত দ্বিমত ছিল। তিনি বলতেন, হযরত আলীই ছিলেন প্রথম খলীফা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, তাঁর এই মত উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থি; দ্বিতীয়ত, অসংখ্য হাদীসে হযরত আলীর তুলনায় হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমের 'মর্যাদাধিক্য' প্রমাণিত; তথাপি, তাঁর এই দ্বিমত আকীদাগত না হওয়ায় তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। আর তিনি তো প্রথম তিন খলীফার মর্যাদা অস্বীকার করেননি; শুধু হযরত আলীকে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী মনে করেছেন।

মূলত তিনি অগ্রজের উপস্থিতিতে অনুজের 'ইমামত বা নেতৃত্ব' বৈধ মনে করতেন। তাই, দ্বিমত যদিও ছিল তবু তিনি প্রথম তিন খলীফার ইমামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। মোটকথা, শুধু এই একটি প্রসঙ্গ ছাড়া শরীয়তের অন্য সকল মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে তার কোনো রকম দ্বিমত ছিল না।

হযরত যায়েদ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র। তিনি খলীফা হিশাম ইবনু মালিকের শামনামলে দাদার পদাঙ্ক

অনুসরণ করে ভক্তদের নিয়ে উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১২২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এতে ভক্তরা সাময়িকভাবে দমে গেলেও পরবর্তী সময়ে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে নতুন এক মতাদর্শ গড়ে তোলে। ইতিহাসের পাতায় সেটি 'যায়দিয়া' বা 'যায়েদী' মতবাদ নামে পরিচিত।

বর্তমানে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস ইয়েমেনে। তাদেরকে যদিও কথিত শিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রথম তিন খলীফার ওপর হযরত আলীকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আহ্লুস সুন্নাহর সঙ্গে তাদের মতভেদ ছিল না। উপরন্তু নামমাত্র শিয়া এ দলটি আহ্লুস সুন্নাহর সঙ্গে এত বেশি সাদৃশ্য রাখে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ্লুস সুন্নাহ ও তাদের মাঝে কোনো অমিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, হযরত যায়েদ রহিমাহুল্লাহর অনুসারীদের একটি দল একবার হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব জানতে চায়। এ সময় তিনি তাঁদের নামে ভালো কথা বলেন ও রহমতের দোয়া করেন। এতে তারা বেশ ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁর দোয়া প্রত্যাখ্যান করে। এখানেই শেষ নয়, তারা এ মহান সাহাবীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার পর্যন্ত করে; এমনকি শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ রহিমাহুল্লাহর আনুগত্য থেকেই বেরিয়ে আসে।

সর্বোপরি এ দলটি একদিকে যেমন হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব অস্বীকার করেছে, অপরদিকে ত্যাগ করেছে হযরত যায়েদের আনুগত্যও। একের-পর-এক অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার কারণে ইতিহাসে তারা 'রাফিজী' (বিদ্রোহী) নামে অভিহিত হয়েছে। আর এ দলের এক অনুসারীর হাত ধরেই পরবর্তী সময়ে যাত্রা শুরু করেছে 'ইসনা আশারিয়া মতবাদ'; যা বর্তমানে শিয়াদের মাঝে সর্বাধিক চর্চিত।

যায়েদ ইবনু আলীর আট বছর পূর্বে (১১৪ হি.) তার ভাই মুহাম্মদ আল-বাকির মৃত্যুবরণ করেন; রেখে যান সাত জন সন্তান-সন্ততি।

তাদের মাঝে জাফর আস-সাদিক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ। আকীদা-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন সাহাবী, তাবেয়ী ও তৎকালীন আলেমদের পরিপূর্ণ অনুসারী।

দেখতে দেখতে উমাইয়া শাসনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। আব্বাসীরা তাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য ব্যাপক উদ্দীপনা নিয়ে জনমত তৈরি করার কাজে নেমে পড়ে। ক্রমেই দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আর এতে ইন্ধন জোগায় যায়েদ ইবনু আলী রহিমাহুল্লাহর আদর্শ থেকে বিচ্যুত সেই অবাধ্য উপদলটি।

১৩২ হিজরীতে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে; যাত্রা শুরু করে আব্বাসী খেলাফত। প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর পর সাম্রাজ্যের হাল ধরেন খলীফা আবু জাফর আল-মানসুর।

এদিকে আন্দোলনের সহযোগীরা সামগ্রিকভাবে লাভ-ক্ষতির হিসেব কষে দেখতে পায়—পরিশ্রমের তেমন কোনো মূল্যই তারা পায়নি। তাদের কামনা ছিল—নতুন শাসক হবে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খানদানের কেউ। কিন্তু খেলাফতের ঝান্ডা আব্বাসীদের হাতে গেলে তাদের সে আশার গুড়ে বালি। উপায়ান্ত না দেখে তারা নতুনোদ্যমে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এবার হযরত আলী ইবনু তালিবের নামানুসারে নাম ধারণ করে 'তালিবী'।

মুসলিম উম্মাহর সর্বাঙ্গে অস্থিরতা বিরাজ করলেও আকীদা ও ফিকহের মৌলিক বিষয়ে তেমন কোনো বিরোধ তখনও পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু হঠাৎ হযরত যায়েদের অবাধ্য সেই দলটি আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ব্যাপারে আপত্তি তোলে। এই দুর্ভাগারা মহান দুই খলীফার নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে বসে, তাঁদের নাম ধরে প্রকাশ্যে বদদোয়াও করতে শুরু করে।

জাফর আস-সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উত্তরসূরি হিসেবে রেখে যান পুত্র মুসা আল-কাজিমকে। মুসাও বাবার মতো দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন; কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পিতার সমপর্যায়ের ছিলেন

না। মুসা আল-কাজিম ইন্তেকাল করেন ১৮৩ হিজরীতে। বড়ো একটি পরিবার রেখে যান তিনি। তাদের মধ্যে পুত্র আলী ইবনু মুসা রেজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তালিবীরা যখন বিদ্রোহ শুরু করে তখন খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন আব্বাসী খেলাফতের সুপ্রসিদ্ধ খলীফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল-মামুন। তিনি বিদ্রোহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখেন এবং সকল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। তালিবীদের দাবি ছিল হযরত আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের নয়, বরং হযরত আলী ইবনু তালিবের বংশের কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা। বিষয়টি সামনে রেখে খেলাফতের বায়আতের জন্য তিনি আলী ইবনু মুসা রেজাকে মনোনীত করেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আব্বাসীদের মাঝে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করে।

২০৩ হিজরীতে আকস্মিকভাবে হযরত আলী ইবনু মুসা মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যুর জন্য তাঁর সমর্থকরা খলীফা আল-মামুনকে দোষারোপ করে। একসময় তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে তুমুল বিদ্রোহের ডাক দেয়; ঠিক যেমনটি করেছিল উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে।

কয়েক বছর এভাবে কেটে গেল। দ্রোহের আগুন কিছুটা নিষ্প্রভ হলো। দীর্ঘ এ সময়ে কত কী ঘটে গেছে, কিন্তু 'শিয়া মতবাদ' নামে স্বতন্ত্র কোনো ধর্মীয় মতবাদ তখনও অস্তিত্বে আসেনি। আর বিদ্রোহ-বিপ্লব বলতে যা ঘটেছে, সবই ছিল রাজনৈতিক বা ক্ষমতা-কেন্দ্রিক। এর পেছনে অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিল। তবে বর্তমান শিয়াদের সঙ্গে আহলুস সুন্নাহর যত আকীদাগত বিরোধ রয়েছে, তার কোনোটিই তখন ছিল না।

উল্লেখ্য, শাসকদের বিরুদ্ধে চলমান এসব সংগ্রামে সক্রিয় থাকার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুযোগ ছিল পারস্যবাসীর।[১] তাদের বিশাল সাম্রাজ্য ইসলামী সালতানাতের অধীনে চলে গেলে অনেকে তা মেনে নিতে পারেনি; আফসোস করতে থেকেছে। কারণ, আরব মুসলিমদের তুলনায়

১. বর্তমান ইরান

নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৌলীন্য তাদের কাছে অধিকতর সমৃদ্ধ ও উন্নত মনে হতো।

এসব ভাবনা থেকে পরবর্তী সময়ে তাদের মাঝে 'শুউবী' নামে একটি বিশেষ দল আত্মপ্রকাশ করে। যাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামবহির্ভূত একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করা। তাদের অনেকেই পারসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি হৃদয়ে থাকা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পছন্দের সে তালিকায় স্থান পায় একসময়ের অন্যতম উপাস্য 'আগুন'।

একদিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বিদ্রোহের সক্ষমতা শুউবী সম্প্রদায়ের ছিল না, অপরদিকে কয়েক দশক ধরে তাদের পরিচয় ছিল মুসলিম; তাই তালিবীদের বিদ্রোহ তাদের ভাগ্যবদলের মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের সুবিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে তারা 'তালিবী আন্দোলনে' যোগ দেবে; কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে আসা মুসলিম পরিচয় তারা এখনই ত্যাগ করবে না।

তারা আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলিম সমাজে পারসিক সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করবে; দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিরাজমান অস্থিরতার সুবাদে ইসলামকে কুসংস্কারের মোড়কে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

এখানেই শেষ নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা তালিবীদের সঙ্গে মিলে যাবে এজন্য যে, তারা নিজেদেরকে আলী ইবনু আবু তালিবের দলভুক্ত দাবি করে; তা ছাড়া তাদের একটি অংশ তো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত; মানুষের মনেও তাদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি। আসলে শুউবীরা বুঝতে পেরেছিল, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার এ আন্দোলন হয়তো এভাবেই স্থায়িত্ব লাভ করবে।

এভাবেই পারসিক শুউবীদের আন্দোলন আহলে বাইত তালিবীদের আন্দোলনের সাঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; যদিও নতুন রূপ ও সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে এগিয়ে চলা এ সংগ্রামের শুধু রাজনৈতিক নয়, ছিল ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য।

ফিরে যাই তালিবী আন্দোলনের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায়। আমরা জেনেছি, আলী ইবনু মুসা রেজাকে বায়আতের জন্য মনোনীত করার পর তিনি মারা যান; তার মৃত্যুর পর সামনে আসেন তদীয় পুত্র মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ। তিনি ইন্তেকাল করেন ২২০ হিজরীতে। তাঁর পর নেতৃত্ব দেন তদীয় পুত্র আলী ইবনু মুহাম্মদ আল-হাদী। আল-হাদী মারা যান ২৫৪ হিজরীতে। অবশেষে হাদীপুত্র হাসান ইবনু আলী তাদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। হাসান ইবনু আলীর উপাধি ছিল 'আল-আসকারী'। ২৬০ হিজরীতে মুহাম্মদ নাম্নী পাঁচ বছরের এক শিশুসন্তান রেখে তিনিও পরকালে পাড়ি জমান।

বিগত এই বছরগুলোতে খেলাফতের বিরুদ্ধে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আহলে বাইত তালিবী ও পারসিক শুউবীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রত্যেক নেতার অবর্তমানে নেতৃত্বের ঝান্ডা তারা তুলে দিয়েছে সদ্যপ্রয়াত নেতার বড়োপুত্রের হাতে।

আলী ইবনু মুসা রেজা থেকে হাসান আল-আসকারী পর্যন্ত নেতৃত্বের এই ধারা অব্যাহত ছিল। আলী ইবনু মুসার পূর্বে উর্ধ্বক্রম অনুসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর বাবা মুসা আল-কাজিম, দাদা জাফর আস-সাদিক এবং পরদাদা মুহাম্মদ আল-বাকির। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হলো, উমাইয়া কিংবা আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে এদের কেউ বিদ্রোহাত্মক নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি।

হাসান ইবনু আলী আল-আসকারী ২৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বিদ্রোহীরা মারাত্মক নেতৃত্ব সঙ্কটে পড়ে। কারণ, হাসান আল-আসকারীর পুত্র তখনও দুধের বাচ্চা। এরই মধ্যে শেষ ভরসা এ শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; ফলে দেখা দেয় নানা রকম মতবিরোধ। এসব বিরোধ যেমন ছিল রাজনৈতিক, তেমনই ছিল শরীয়তের বিধান ও আকীদা-কেন্দ্রিক।

বিদ্রোহীদের এতগুলো দল ও সম্প্রদায়ের মাঝে সর্বাধিক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে 'ইসনা আশারিয়া' সম্প্রদায়। বর্তমানে এ সম্প্রদায়ের

অধিকাংশের বসবাস ইরান, ইরাক ও লেবাননে এবং এরাই শিয়াদের সকল দল ও উপদলের মাঝে জনসংখ্যায় সর্বাগ্রে।

তাদের এই বিভক্তি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে তখন, যখন দলের নেতারা নিজেদের প্রয়োজনমতো ইসলামের বিধানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়-আশয় সংযোজন করে; নিজ নিজ দলের সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে গ্রহণ করে নানান পদক্ষেপ; আর এর সবই সম্ভব হয়েছিল একজন সর্বজনীন নেতার অনুপস্থিতির সুবাদে।

ইসলামের নামে তারা নিকৃষ্ট সব বিদআতের সূচনা করে। এরপর এসব বিদআতকে 'দীনের অপরিহার্য অংশ' বলে দাবি করে। একপর্যায়ে এগুলো তাদের আকীদা ও গঠনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। এসব বিদআতের মধ্যে 'ইমামত' তথা নেতৃত্ব-সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মাধ্যমে নেতৃত্ব সম্পর্কিত সকল সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা পোষণ করে। তাই চারদিকে খুব জোর দিয়ে প্রচার করতে থাকে যে, ইমাম বা নেতা হওয়ার যোগ্য ছিলেন কেবল 'বারো জন মনীষী'; তাদের নাম যথাক্রমে :

১. আলী ইবনু আবু তালিব
২. হাসান ইবনু আলী
৩. হুসাইন ইবনু আলী
৪. আলী যাইনুল আবিদীন ইবনু হুসাইন
৫. মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনু যাইনুল আবিদীন
৬. জাফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মদ আল-বাকির
৭. মুসা আল-কাজিম
৮. আলী আল-রিজা
৯. মুহাম্মদ আল-জাওয়াদ
১০. আলী আল-হাদী
১১. হাসান ইবনু আলী আল-আসকারী
১২. মুহাম্মদ ইবনু হাসান আল-আসকারী।

বারো ইমামের এ ধারণা থেকেই শিয়াদের একটি দল 'ইসনা আশারিয়া' নামে পরিচিত হতে থাকে। ইমামদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে তারা আরও একটি নতুন আকীদা প্রণয়ন করে। বলে, 'মুহাম্মদ ইবনু হাসান নামের শিশুটি এখনো মারা যায়নি; কোনো একটি পাহাড়ের গোহায় আত্মগোপন করে হাজারও বছর ধরে বেঁচে আছে। যথাসময়ে ফিরে এসে সে উম্মাহর নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে।'

কাল্পনিক এ শিশুটিই তাদের মতে প্রতিশ্রুত ইমাম 'মাহদী'। তারা এমন দাবিও করে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বারোজন ইমামের ব্যাপারে নাম ধরে ওসিয়ত করে গেলেও সাহাবায়ে কেরাম তা গোপন করেছেন। এ কারণেই তাদের মতে অধিকাংশ সাহাবী কাফের এবং বাকিরা ফাসেক। কেননা তারা জেনেশুনে ইমামদের প্রসঙ্গে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপন করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ!)

এরপর তারা পারসিক চিন্তাধারা থেকে আনীত উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টি ইমামদের নামে চালিয়ে দেয়; দাবি করে, আলী ইবনু আবু তালিব থেকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে যারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রয়াণের পর তাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রই ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। অথচ আমরা সকলেই জানি, ইসলামে এমন কিছুর কোনো ভিত্তি নেই। এমনকি ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে সুন্নীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত খেলাফতব্যবস্থা তথা, উমাইয়া, আব্বাসী, সেলজুকী, আইউবী ও উসমানী খেলাফতে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তির ধারা অব্যাহত থাকলেও তাদের কেউই কখনো এটিকে ধর্মীয় বিধান বলেননি বা তারা এটিকে বংশগত অধিকার বলে মনে করতেন না।

পারসিক মতাদর্শ থেকে আমদানিকৃত তাদের আরও একটি নিকৃষ্ট আকীদা হলো, শাসককে নিষ্পাপ জ্ঞান করা। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইমামরা নিষ্পাপ; উল্লিখিত সকল ইমাম সব গুনাহ থেকে পবিত্র। ফলে ইমামদের বক্তব্য তাদের কাছে কুরআন ও হাদীসের মতোই গ্রহণযোগ্য। এমনকি, এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে শরীয়তের বিধান বলতে যা মান্য ও গ্রহণযোগ্য, এর প্রায় সবই নাকি ইমামদের বাণী

থেকে গৃহীত; যদিও বাস্তবে সেগুলো হয়ে থাক ইমামদের মুখনিঃসৃত কিংবা তাঁদের নামে আরোপিত।

আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ইরানী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা জনাব খোমেনী নিজ গ্রন্থ *আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়াতে* বলেন, 'আমাদের মতবাদের একটি আবশ্যিক বিশ্বাস এই যে, আমাদের প্রত্যেক ইমাম এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, প্রথম সারির কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলের পক্ষেও সে মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয়নি।'[১]

এই সূত্রে তারা প্রায় সকল সাহাবীর প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষ পোষণ করে। মাত্র কয়েকজন সাহাবী তাদের বিষোদগার থেকে রেহাই পেয়েছেন; যাঁদের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ তেরো।

অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই যে, তাদের এ নগ্ন থাবা থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারভুক্তরাও মুক্তি পাননি। নবীজির চাচা হযরত আব্বাস ও চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার দিকেও নিক্ষেপিত হয়েছে শত্রুতার তির। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস হলেন 'হিবরুল উম্মাহ' বা 'জ্ঞানে-গুণে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব'।

এ কথা সকলেরই জানা, তারা এই মহান দুই সাহাবীর বিরুদ্ধে বিষোদগারে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি তাদেরকে কাফের পর্যন্ত বলেছে কেবল এ কারণেই যে, আব্বাসী খলীফাদের সাথে ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতবিরোধ ছিল। অথচ আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠার কতকাল আগেই তাঁরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

আরও একটি নিকৃষ্ট বিদআত ছিল সে সময়ের অধিকাংশ ইসলামী সাম্রাজ্যকে 'দারুল কুফুর' দাবি করা। এই দাবির আলোকে মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ও মিশরের মুসলমানরা ছিল তাদের কাছে কাফের। এমন উদ্ভট দাবিকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নির্জলা মিথ্যা বলতেও তাদের কোনো দ্বিধা ছিল না।

---

১. খোমেনি কৃত *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া*, পৃষ্ঠা : ২৫

এমনকি, এসব মিথ্যাই তাদের কাছে ধর্মীয় অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মৌলিক গ্রন্থসমূহ যেমন : *আল-কাফী*, *বিহারুল আনওয়ার*, *তাফসিরুল কুম্মী*, *তাফসিরুল আয়্যাশী*, *আল-বুরহান* ইত্যাদিতে এখনো এসব নিকৃষ্ট মিথ্যা বিদ্যমান।

কেবল সাহাবীরাই নয়; আহলুস সুন্নাহর সকল মনীষীই তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য; উম্মাহর মহান ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থগুলোও তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত; 'সিহাহ সিত্তাহ' বা হাদীসের বিশুদ্ধ ছয় কিতাবসহ সকল হাদীসগ্রন্থই তাদের কাছে পরিত্যক্ত। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ থেকে শুরু করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মতো মহান ইমামগণ যেমন তাদের কাছে তুচ্ছ; তেমনই খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, উমর ইবনু আব্দুল আযিয, মুসা ইবনু নুসাইর, নুরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহুদ্দীন, কুতুয এবং মুহাম্মদ আল-ফাতিহের মতো বীর সেনারাও অতি সামান্য।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন এবং হাদীস ও তাফসীরের কিতাব-পত্র প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি তারা গ্রহণ করেছিল উল্লিখিত ইমামদের দিকে সম্পৃক্ত এমন কিছু কথামালা—যেগুলো যারপরনাই দুর্বল সূত্রে বর্ণিত। ফলে তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে নানা রকমের বিদআত; যার কোনোটি আকীদাগত, কোনোটি ইবাদত সম্পর্কিত, কোনোটি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকারের বিদআত তাদের মাঝে চর্চিত হতে থাকে, যেসবের সঙ্গে ইসলামী শরীয়তের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

এখানে এই স্বল্প পরিসরে তাদের সকল বিদআত নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। কারণ সেজন্য একাধিক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন পড়বে। এজন্য এখানে কেবল সমস্যার মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরব; যাতে শাখাগত বিষয়-আশয় খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। অন্যথায় তাকিয়া, পুনর্জনম, কুরআন বিকৃতি নিয়ে বিভ্রান্তি, আল্লাহর সম্পর্কে নিকৃষ্ট আকীদা, মাজারে নানা রকম কুসংস্কারের চর্চা, হযরত হুসাইনের

শাহাদাত দিবস-কেন্দ্রিক নানা রকম অসারতা—এমন হাজারও বিদআত ইসনা আশারিয়াদের কাছে ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত—সেসব নিয়ে কথা বলতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো কেবল ইসনা আশারিয়া শিয়াদের মতাদর্শের একাংশ। সে যুগে ইসনা আশারিয়া ছাড়াও অনেক দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছিল। ইতিহাসের পাতায় 'হাইরাতুশ শিয়া' বা 'শিয়াদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা' শিরোনামে যে সময়ের কথা আলোচিত হয়েছে, তা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে দুরবস্থার সূচনা হয়েছিল হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি, তাদের এগারোতম ইমাম হাসন আল-আসকারীর ইন্তেকাল-পরবর্তী সময়ে।

এ সময় শিয়ারা তাদের গ্রন্থরচনা ও প্রচারণার কাজ শুরু করে। এতে তাদের আকীদা ও চিন্তাধারা মানুষের মনে মজবুত হতে থাকে। এরপর বিশেষভাবে পারস্যাঞ্চলে এবং সাধারণভাবে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যদিও তখনও পর্যন্ত এই মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি, কিন্তু হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে একের-পর-এক বিপর্যয় ঘটতে থাকে, যে কারণে বেশকিছু এলাকার শাসন-ক্ষমতা শিয়াদের হাতে চলে যায়। মুসলিম উম্মাহর মাঝে যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী।

যে কথাটি পুনরুক্ত না করলেই নয় তা হলো, কোনো বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা মূলত সে বিষয়ে রাখা ভাবনারই অংশ। তাই কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইলে অবশ্যই সে বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে; খুব ভালোভাবে জেনেই কেবল কোনো প্রসঙ্গে বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণা দেওয়া যাবে, কদর্য ও উত্তমতা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। অন্যথায়, পড়াশোনা ও গবেষণা থেকে মুক্ত, আবেগতাড়িত কথামালা তো কেবল ক্ষতিই বয়ে আনবে।

শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার

'শিয়াদের গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি অধ্যয়নে পাঠক বেশ অবাক হয়েছেন; তাদের মন্তব্য থেকে সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কেবল ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বলে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে এর শিক্ষণীয় দিকগুলোও আমরা তুলে ধরতে চাই; যাতে করে আমাদের পক্ষে সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

এ কারণে মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে বর্তমান প্রজন্মের বিমুখতা অপরাধ বলেই গণ্য করা যায়। কেননা, ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে বিরত থেকে আমরা নিজেদের কেবল বঞ্চিতই করছি। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলি জানার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট হয়েছি, যেন তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। কুরআন কারীমে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

'(হে নবী) আপনি (তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের) ঘটনাসমূহ বর্ণনা করুন; হয়তো তারা চিন্তাভাবনা করে দেখবে।'[১]

সুতরাং, ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা ঘটনাগুলো কেবল আলোচনার মাঝেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না; বরং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে হবে; খুঁজে বের করতে হবে জ্ঞানের

---

১. সূরা আল-আরাফ : ১৭৬

এমন উপাদান, যা বর্তমানের জন্য হবে উপকারী, ভবিষ্যতের জন্য হবে সঠিক পথের দিশারি।

প্রিয় পাঠক, শিয়াদের নিয়ে আমার এবারের আলোচনার প্রারম্ভে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখতে চাই :

এক. এই আলোচনাটি যথাযথভাবে বুঝতে হলে 'শিয়াদের গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অবশ্যই আপনার পাঠে থাকতে হবে। কারণ, সেখানে শিয়াদের উৎপত্তির ইতিহাসের পাশাপাশি আকীদাগত দিকও কিছুটা আলোচিত হয়েছে, যার ওপর নির্ভর করছে আগত ঘটনাপ্রবাহ বোঝার বিষয়টি।

দুই. এখানে আমরা কেবল বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ঘটনাগুলোই যথাযথভাবে উল্লেখ করতে চেষ্টা করব। শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ধরন নিয়ে চূড়ান্ত কিছু বলব না।

ফিরে আসি শিয়াদের গল্পে...

শিয়াদের এগারোতম ইমাম হযরত হাসান আল-আসকারীর ইন্তেকালে পর তারা মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়। ইতিহাসের পাতায় এ সময়টি 'হায়রাতুশ শিয়া' বা 'শিয়াদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা' শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে। এ সময়ে তারা অনেক দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের পছন্দমতো ধর্মীয় মতাদর্শ ঠিক করে নেয়। তবে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক উৎকর্ষতা লাভের বিষয়টি সবার কাছেই ছিল সর্বাগ্রে।

শিয়াদের দলগুলোর মাঝে 'ইসনা আশারিয়া' বা 'বারো ইমাম পন্থি' দলটি ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বিগত প্রবন্ধে তাদের আলোচনা কিছুটা করা হয়েছে। তবে মাঠে তারা একাই সক্রিয় ছিল না; তাদের সাথে আরও একটি খতরনাক দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 'ইসমাঈলিয়া' নামের এ দলটির আত্মপ্রকাশ মুসলিম উম্মাহর মাঝে মারাত্মক ভীতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ইসমাঈলিয়া শিয়ারা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট। অধিকাংশ আলেম-ওলামার মতেই তারা মুসলিম নয়। জনৈক ধূর্ত ইহুদীর মাধ্যমে এ দলটির উৎপত্তি ঘটে। ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়ংকর চক্রান্তের পরিকল্পনা নিয়ে মাইমুন আল-কাদ্দাহ নামের সে লোকটি প্রথমে ইসলাম প্রকাশ করে মুসলিম সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তার মুখে ছিল ইসলামপ্রীতি থাকলেও অন্তরজুড়ে ছিল সীমাহীন মুসলিমবিদ্বেষ।

খুব কায়দা করে সে জাফর আস-সাদিকের পৌত্র মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈলের সংস্পর্শে আসে এবং কিছুকাল তার কাছে অবস্থান করে। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ছিলেন ইসনা আশারিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের নাতি এবং সপ্তম ইমাম মুসা আল-কাজিমের ভাতিজা; সর্বোপরি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

মাইমুন আল-কাদ্দাহ এক অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করে—যা ছিল মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অংশ। আমল-আকীদা বিধ্বংসী এ পরিকল্পনা তার মৃত্যুর কয়েক দশক হলেও বাস্তবতার মুখ দেখেছিল।

মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈলের ছেলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। মাইমুন নিজেও তার ছেলের নাম আব্দুল্লাহ রাখে, সঙ্গে তার উত্তরসূরিদের নাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈলের উত্তরসূরিদের নামানুসারে রাখার ব্যাপারে ওসিয়ত করে। তার ইচ্ছা ছিল কয়েক দশক পর তার উত্তরসূরিরা নিজেদেরকে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু জাফর আস-সাদিকের বংশধর হিসেবে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত দাবি করবে।

শুধু তাই নয়, তারা এ দাবিও করবে যে, 'মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতা' মুসা আল-কাজিম ইবনু জাফর আস-সাদিকের বংশ থেকে নয়, বরং ইসমাঈল ইবনু জাফর আস-সাদিকের বংশ থেকেই হওয়া আবশ্যক। ওদিকে ইসনা আশারিয়াদের দাবি এর ঠিক উল্টো।

ইহুদী মাইমুন আল-কাদ্দাহর সকল ইচ্ছা একের-পর-এক বাস্তবায়িত হয়। তার পরিকল্পনা অনুসারে একসময় প্রতিষ্ঠা পায় ইসমাঈলিয়া

সম্প্রদায়। মাইমুনের উত্তরসূরিরা এ সম্প্রদায়ের মতাদর্শ নিজেদের পছন্দমতো সাজিয়ে নেয়—যাতে স্থান পায় ইসলামবিরোধী যত আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা। মৌলিক কিংবা সামগ্রিক—কোনো বিবেচনায়ই তাতে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও মতাদর্শের মাঝে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়টি ছিল শাসকদের মাঝে আল্লাহর অবতরণের বিশ্বাস। এর ওপর ভিত্তি করে তারা শাসককে খোদা মনে করত। পুনর্জীবনের প্রতিও ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাদের ধারণা, মৃত্যুর পর সকল মানুষের আত্মা বিশেষত শাসকদের আত্মা অন্য কারও দেহে নতুন জীবন নিয়ে ফিরে আসে; সুতরাং বিগত সকল ইমাম অবশ্যই পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন।

এখানেই শেষ নয়, স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যতার সকল সীমা ছাড়িয়ে তারা সাহাবীদের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করতে থাকে। এমনকি, তাদের বিষোদগার থেকে রক্ষা পাননি স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; অথচ এরাই আবার দিনশেষে তাঁর উত্তরসূরি হওয়ার দাবিদার!

তাদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র বিশ্বে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী শাসকদের পরাস্ত করা—যাতে করে তাদের সামনে আর কারও দাঁড়ানোর সুযোগ না থাকে। এ বিষয়ে অচিরেই আমরা সবিস্তার আলোচনা করব।

ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ ব্যাপক উদ্যোমের সাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বরাবরের মতো অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝেই এ জঘন্য মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে আহলে বাইতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও দুর্বলতার দিকটি তারা সুকৌশলে কাজে লাগায়। এভাবে একপর্যায়ে তাদের দলের লোকেরা সত্যি সত্যিই তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি ভেবে নেয়।

তাদের এই আহ্বানে পারসিকরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। যারা ছিল মুখে মুখে ইসলামপ্রেমী এবং মনে মনে অগ্নিপূজারি। এদের মাঝে একজনের নাম ছিল হুসাইন আল-আহওয়াযী। এ লোকটি ছিল

ইসমাঈলিয়া মতবাদের প্রসিদ্ধ আহ্বায়ক ও প্রথম সারির নেতা। বসরায় বসবাসকারী এ লোকটির সাথে সাক্ষাৎ হয় ইসলামের ইতিহাসের আরেক নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে, যার নাম ছিল হামদান ইবনু আশয়াস। এ হতভাগার পূর্বসূরিরা ছিল পারস্যের অগ্নিপূজারি বা বাহরাইনের ইহুদী।

হামদান ইবনু আশয়াস সুযোগ বুঝে 'কারমাত' উপাধি গ্রহণ করে। এরপর সময়ের ব্যবধানে 'কারমাতি' (বহুবচনে কারামিতা) নামে একটি আলাদা দল গঠন করে। যদিও এরা ইসমাঈলিয়া মতবাদের অনুসারী উপদল ছিল; কিন্তু আচরণ ও উচ্চারণে ছিল তাদের চেয়েও ভয়ংকর। তাদের কাছে যেমন সম্পদের নির্দিষ্ট মালিকানা ছিল না, তেমনই নারী সম্ভোগেরও ছিল না সাধারণ কোনো নীতিমালা। জিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, খুন-লুণ্ঠনের মতো জঘন্য ও অমানবিক কাজ-কর্মও তাদের কাছে ছিল বৈধ। এই সুবাদে চারপাশের চোর, ডাকাত, বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসীরা দলে দলে তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের ইতিহাসে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী সম্প্রদায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঐতিহাসিক এমন আরও অসংখ্য উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে, যার সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এ সময়ে শিয়ারা বড়ো বড়ো তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি দলই নিজেদেরকে সর্বাধিক সত্যানুসারী বলে দাবি করত। কিন্তু আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে সাধারণ বিধি-বিধানেও তাদের মাঝে যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। শিয়াদের সে প্রধান তিনটি দল হলো ইসনা আশারিয়া, ইসমাঈলিয়া ও কারামাতিয়া।

সামগ্রিকভাবে এই তিন দলের সঙ্গে যেমন আহলুস সুন্নাহর বিরোধ ছিল, তেমনই তাদের নিজেদের মাঝেও ছিল সম্পর্কের টানাপোড়েন। তাদের এক দল অপর দলকে খুব একটা দেখতে পারত না। সর্বোপরি শিয়াদের এ তিন দলের প্রত্যেকটিই ছিল প্রবৃত্তির পূজারি ও বিদআতের অনুসারী।

ইতিহাসের এই পর্যন্ত শিয়ারা যা কিছু ঘটিয়েছে, তাতে কেবল মুসলিম উম্মাহর মাঝে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তখন শিয়াদের হাতে শাসনক্ষমতা ছিল না, তবু চলমান কিছু বিষয় ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। এরপর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে একের-পর-এক মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘটনা ঘটতে থাকে; যা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়।

উল্লিখিত তিনটি দলের মাঝে কারমাতিরা সবার আগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। কারণ তাদের দলে ছিল অসংখ্য দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। তাদের প্রথম সারির এক নেতার নাম ছিল রুস্তম ইবনুল হুসাইন। সে ইয়েমেনে গিয়ে স্বতন্ত্র কারমাতি সাম্রাজ্য কায়েম করে। অতঃপর বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের কাছে পয়গাম পাঠাতে শুরু করে। এই সুবাদে একসময় কারমাতি মতাদর্শের বার্তা মরক্কো পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই তাদের এই সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও এর পাশাপাশি 'জাজিরাতুল আরব' বা 'আরব উপদ্বীপ' এবং বিশেষভাবে এর পূর্বাংশে কারমাতিদের ব্যাপক উত্থান ঘটে। একপর্যায়ে এই অঞ্চলেও তারা একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। যাতে মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। কারমাতিদের হাতে হাজিদের প্রাণ হারানোর ঘটনা থেকে সে পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায়।

তাদের যাবতীয় কুকীর্তির মাঝে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর ছিল ৩১৭ হিজরীতে 'তারবিয়া দিবস' তথা : জিলহজ মাসের ৮ তারিখে মসজিদুল হারামে অবস্থানরত সকল হাজিকে হত্যা করা এবং মারাত্মক অসম্মানপূর্বক 'হাজরে আসওয়াদ' চুরি করা। চুরিকৃত হাজরে আসওয়াদকে তারা তাদের রাজধানী পূর্ব-জাজিরায় প্রেরণ করে। সেখানে পূর্ণ ২২ বছর থাকার পর ৩৩৯ হিজরীতে পবিত্র এ প্রস্তরটি আপন স্থান ফিরে পায়।

এদিকে ইসমাঈলিয়ারা মরক্কোর ভূমি নিজেদের অনুকূলে পেয়ে যায়। সেখানে রুস্তম ইবনুল হুসাইন ইয়েমেন থেকে কারমাতি মতাদর্শের বার্তা ছড়িয়ে রেখেছিল। এটি সে করেছিল আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী নাম্নী

এক লোকের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ইসমাঈলিয়া ও কারমাতি উভয় দলই ইসমাঈল ইবনু জাফর আস-সাদিকের ইমামাত বা নেতৃত্বে বিশ্বাসী। এই সুবাদে মাইমুন আল-কাদ্দাহের উত্তরসূরি উবাইদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন[১] নামের এক লোক মরক্কোতে স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য কায়েমের অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে যায়। এবং সুযোগটি সে যথাযথভাবে কাজেও লাগায়।

প্রথমে সে তার অনুসারীদের নিয়ে ইসমাঈলিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণাই দেয়। কিন্তু এরপর সে 'মাহদী' উপাধি ধারণ করে এবং নিজেকে ইসমাঈলী পয়গামের ইমাম দাবি করে। তারপর দাবি করে যে, সে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু জাফর আস-সাদিকের উত্তরসূরি এবং তার আগে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষদের সকল ইমাম সুপ্ত ছিলেন।

এমন নাটকীয় ইমামত ও সাম্রাজ্যের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া মুশকিল। তাই তাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এর নাম দেওয়া হয় 'ফাতিমী সাম্রাজ্য'। নামকরণটি ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার নামানুসারে। অথচ ওই হতভাগার পূর্বসূরিরা ছিল ইহুদী।

মূর্খদের আবেগকে পুঁজি করে তাদের এই মতাদর্শ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে; সাথে হতে থাকে তাদের ক্ষমতার বিস্তার। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তাদের আয়ত্তে চলে যায়। নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে দেয় নানা রকম বিদআত, কুসংস্কার ও সাহাবা-বিদ্বেষ। এ ছাড়া স্রষ্টার অবতরণ, শাসকদের পুনর্জনম ইত্যাদি ভ্রান্ত আকীদা তো ছিলই।

কথিত এই ফাতিমী সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় মিশরকেও গ্রাস করে নেয়। ঘটনাটি ঘটে ৩৫৯ হিজরী সালে 'মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ আল-উবাইদী'র[২] শাসনামলে সেনাপতি জাওহার সিসিলি

---

১. পূর্ণাঙ্গ বংশ পরম্পরা : উবাইদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনু আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাইমুন আল-কাদ্দাহ।

২. মুইযের উপাধি ফাতিমী নয় বরং উবাইদুল্লাহ আল-মাহদীর দিকে সম্পৃক্ত করে 'উবাইদি' হওয়াই সঙ্গত। -লেখক

ইসমাঈলীর হাতে। এরপর মুইয মিশরে গিয়ে কায়রো শহর ও আল-আযহার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে। আল-আযহার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইসমাঈলি শিয়া মতাদর্শের প্রসার ঘটানো। কিন্তু এসব কাজে একমাত্র অন্তরায় ছিল আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ। তাই তারা অন্যায়ভাবে তাঁদেরকে হত্যা করে; জনসম্মুখে প্রকাশ করে ভয়ংকর সাহাবা-বিদ্বেষ।

মুইয-পরবর্তী শাসকরা তার পথেই হেঁটেছে। কেউ কেউ আবার এতটাই উদ্ভ্রান্ত ছিল যে, নিজেকে খোদা পর্যন্ত দাবি করে ফেলেছে। এদের মাঝে প্রসিদ্ধ হলো আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ।

নিজেদের মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তারা অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করে। মিশর, সিরিয়া ও হিজাজের পবিত্র ভূমি দুইশ বছর পর্যন্ত পরাধীন করে রাখে। অবশেষে ৫৬৭ হিজরীতে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম মুসলিম বীর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তিনি ইসমাঈলিয়াদের কবল থেকে মিশরকে মুক্ত করেন।

শিয়াদের তৃতীয় দল ইসনা আশারিয়া। এরাও অসংখ্য বিদআতে নিমজ্জিত। কিন্তু তাদের ভ্রান্তি উল্লিখিত দুই দলের তুলনায় কিছুটা কম। তারা আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। কিন্তু সমস্যা হলো, ধর্মকে তারা নানা রকম বিদআত ও কুসংস্কার দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে।

তাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন লোক পারস্য ও ইরাকের বিভিন্ন এলাকার ক্ষমতাসীন পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। এই সুবাদে পরবর্তী সময়ে তারা বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মসনদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

শিয়া নেতারা পারসিক বংশোদ্ভূত বনু সামান পরিবারের সুদৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়। এই সুযোগে নেতারা তাদের মাঝে শিয়া মতাদর্শের বীজ বপন করে। তৎকালীন পারস্য তথা বর্তমান ইরানের বিশাল অঞ্চল ছিল বনু সামান সাম্রাজ্যের অধীনে। এ সাম্রাজ্য ২৬১ হিজরী থেকে ৩৮৯ হিজরী পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। দীর্ঘ সময়ে তাদের মাঝে শিয়া মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু প্রকাশ্য চর্চা আরম্ভ হয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুর দিকে।

একইভাবে তারা বনু হামদান পরিবারের সঙ্গেও সখ্যতা গড়তে সক্ষম হয়। এরা ছিল আরব বংশোদ্ভূত বনু তাগলিবের শাখা। তারা ৩১৭ হিজরী থেকে ৩৬৭ হিজরী পর্যন্ত ইরাকের মুসেল শহর শাসন করে। ৩৩৩ হিজরী থেকে ৩৯২ হিজরী পর্যন্ত সিরিয়ার আলেপ্পো শহরটিও তাদের আওতাধীন ছিল।

তাদের মিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে খতরনাক ছিল পারসিক বংশোদ্ভূত বনু বুওয়াই পরিবার। পারস্যে তারা স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য কায়েম করতে সক্ষম হয়। ৩৩৪ হিজরীতে আব্বাসী খেলাফতের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে নামমাত্র খলীফাকে বহাল রাখে; উদ্দেশ্য ছিল, সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক সুন্নী মুসলিমদের অভ্যুত্থান এড়িয়ে যাওয়া।

এভাবে ৩৩৪ হিজরী থেকে ৪৪৭ হিজরী পর্যন্ত এক শতাব্দীর বেশি সময়কাল তারা আব্বাসীদের পরাধীন করে রাখে। অবশেষে সেলজুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হলে তাদের সাহায্যে ইরাকের ভূমি শিয়াদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

দীর্ঘ এ শাসনামলে শিয়ারা সাহাবায়ে কেরাম ও আহলুস সুন্নাহর অনুসারী আলেম-ওলামা ও খলীফাদের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে। এমন কোনো নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য আচরণ নেই যা তারা তাঁদের সঙ্গে করেনি। সাহাবীদের নামে গালমন্দ লিখে তারা মসজিদের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছে; হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মতো মহান সাহাবীদের বিরুদ্ধে জুমার খুতবায় বিষোদগার করেছে। সত্যি, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর এমন দুঃসময় খুব কমই এসেছে।

ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে ছিল শিয়াদের জয়জয়কার। ইরানের কিয়দংশ ও সম্পূর্ণ ইরাক ছিল বনু বুওয়াইর দখলে; ইরানের পূর্বাঞ্চল, আফগানিস্তানের কিছু অংশ এবং তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের পূর্বাংশ ছিল বনু সামানের অধীনে; মুসেলের কিয়দংশ এবং আলেপ্পো ছিল বুন হামদানের নিয়ন্ত্রণে।

ওদিকে কারমাতিদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল আরব উপদ্বীপের পূর্বাংশে। তাদের হিংস্র থাবা কখনো পড়ত গিয়ে হিজাজ, দামেশক ও ইয়েমেনে।

এদিকে আফ্রিকার সকল মুসলিম রাজ্যগুলো ছিল কথিত ফাতিমী তথা, উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। আফ্রিকার রাজ্যগুলোর পাশাপাশি তাদের কব্জায় ছিল সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে কারমাতি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। বনু বুওয়াইর শাসনামল সমাপ্ত হয় ৪৪৭ হিজরীতে। আর উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় ৫৬৭ হিজরীতে। অতঃপর সমগ্র ইসলামী বিশ্বে সুন্নী মুসলিমদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যদিও পারস্য ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসনা আশারিয়া চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর তাদের হাতে ছিল না।

৯০৭ হিজরী পর্যন্ত এভাবেই কেটে যায়। এরপর ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারী ইসমাঈল আস-সাফাভী নামের এক ব্যক্তি ইরানে সাফাভিদ[১] সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাবরিজ শহরকে রাজধানী করে শিয়াদের এ নতুন সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করতে থাকে; এমনকি, একপর্যায়ে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পার্শ্ববর্তী সুন্নীদের ওপর হামলে পড়ে; উসমানীদের নিঃশেষ করে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্তুগিজদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিও করে।

তারা উসমানী সাম্রাজ্যের আওতাধীন ইরাকের কিছু এলাকা দখল করে সেখানে শিয়া মতাদর্শ প্রচার করতে শুরু করে। এরপর ৯২০ হিজরীতে সাফাভিদ ও উসমানীদের মাঝে ঐতিহাসিক 'চালডিরেন[২] যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সুলতান প্রথম সালিম সাফাভিদদের বিরুদ্ধে লড়েন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে তাদেরকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করেন।

দিন অতিবাহিত হতে থাকে; চলতে থাকে সাফাভিদ-উসমানী সংঘর্ষ। অধিকাংশ সময় এ সংঘর্ষগুলো হতো ইরাকের শহরগুলোতে। সাফাভিদ শাসনামল তথা, ৯০৭ হিজরী থেকে ১১৪৭ হিজরী পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল। তাদের পতনমাত্রই সমগ্র ইরান খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে

---

১. এই নামকরণ ছিল তার প্রপিতামহ সফিউদ্দীন আল-আরদাবিলীর নামানুসারে। সে ছিল পারসিক বংশোদ্ভূত। মৃত্যু ৭২৯ হিজরীতে। -লেখক

২. Chaldiran (جالديران)

যায়; বিভক্ত অঞ্চলগুলো নিয়ে উসমানী, রুশ, আফগান এবং সাফাভিদ শেষ সুলতান তৃতীয় আব্বাসের সেনাদের লড়াই চলতে থাকে।

এরপর উসমানী সাম্রাজ্য দিনদিন নিস্তেজ হতে থাকে। ইউরোপীয় ও রুশরা তাদের ওপর কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিম ইরানের বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ তারা অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। দুর্ভাগ্যবশত এসব অঞ্চলের এমন শাসকরা ক্ষমতায় আসে, যারা সুসম্পর্কের আড়ালে পশ্চিমাদের কাছে নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিত অনায়াসে। এরা কখনো ইংরেজদের কাছে ধরনা দিত, কখনো ফরাসীদের সামনে হাত পাতত, কখনো-বা ভীক্ষার থালা বাড়িয়ে দিত রুশদের দিকে।

১১৯৩ হিজরী মুতাবেক ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পারসিক বংশোদ্ভূত আগা মুহাম্মদ কাজার ইরানের ক্ষমতায় আসেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি শিয়া মতাবলম্বী হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। এজন্য ইসনা আশারিয়া মতবাদের দিকে কাউকে আহ্বান করতেন না; রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই মতাদর্শ সামনে রাখতেন না।

আগা মুহাম্মাদের অবর্তমানে তার উত্তরসূরিরা শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। তাদের শাসনামলে মাঝে মাঝেই ইরানী সাম্রাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা ঘটত। আগা-পরিবারের শাসকদের উপাধি ছিল 'শাহ'। ১৩৪২ হিজরী মুতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ সালে রেজা পাহলভী আগা-পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজেকে 'শাহে ইরান' দাবি করেন। এ কাজটি তিনি করেছিলেন ইংরেজদের সহযোগিতায়।

ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় এলেও পরবর্তী সময়ে বিরোধের জের ধরে ইংরেজরা ১৯৪১ সালে তাকে ঠিকই দেখে নিয়েছে। ফলস্বরূপ তার মসনদে বসিয়েছে তারই ছেলে মুহাম্মদ রেজা বিহলভীকে। বিহলভী ১৩৯৯ হিজরী মুতাবেক ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতিতে ইরান শাসন করেন। অতঃপর ইরানে ইসনা আশারিয়া মতাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানী বিপ্লব সংঘঠিত হয়।

এই হলো শিয়াদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে তাদের শাসনক্ষমতা পরিচালনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আশা করি এ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, শিয়াদের উত্থান ছিল সুন্নী শাসনের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত এক বিদ্রোহস্বরূপ। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা ধর্মের মুখোশ পরে আহলে বাইতের প্রতি জনমানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে গেছে।

সুদীর্ঘ এ সময়ে আমরা কখনই দেখিনি যে, শিয়াদের কোনো একটি দলের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু ক্রুসেডার, রুশ, ইংরেজ, ফ্রান্স বা পর্তুগিজদের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে; এমনকি তাতারিদের মতো দুর্ধর্ষ ত্রাসদের সঙ্গেও কখনো তাদের সংঘর্ষ হয়নি। উল্টো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, কীভাবে তারা ধাপে ধাপে একে অপরের দিকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এরপরও আমরা বিনা বিচারে অতীত শিয়াদের আচরণের দায় বর্তমান শিয়াদের দেব না। আমরা বরং সমসাময়িক শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, পথ ও পদ্ধতি যাচাই করে দেখব। অতঃপর পূর্বসূরিদের আকীদা-মানহাজ যখন উত্তরসূরিদের মাঝে হুবহু পাওয়া যাবে, তখনই কেবল আমরা তাদেরকে চিহ্নিত করব, ত্রুটিযুক্ত বলব।

তো, যখন আমরা দেখতে পাই অতীত-বর্তমান সকল শিয়া ইমামত তথা নেতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বংশের শর্ত আরোপ করছে, ইমামকে নিষ্পাপ বলছে, হযরত আবু বকর, উমর ও উম্মুল মুমিনীনসহ অন্যান্য সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে, তখন আর কোনোভাবেই তাদের প্রতি সুধারণা বহাল রাখা যায় না; এবং বাধ্য হয়ে বলতে হয়, উত্তরসূরিরা তাদের পূর্বসূরিদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে।

প্রিয় পাঠক, এবার বলুন তো! শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হতে পারে? তাদের সাথে আমাদের আচরণ-উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত? কিছু বলা, নাকি না বলা? কোনটি শ্রেয়? কিছু জানা, নাকি না জানা? কোনটি ভালো?

শিয়াদের নিয়ে শঙ্কা

আমাদের অনেকেই মনে করেন, শিয়াদের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করা বেশ কঠিন কাজ। এজন্য তারা এ বিষয়ে একটুও মাথা ঘামাতে চান না। এর পেছনে অবশ্য বেশকিছু কারণও আছে। চলুন, দেখা যাক :

এক. অজ্ঞতা ও মূর্খতা

অনেকে মুসলমান আছেন, যারা শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই রাখেন না। বলতে গেলে এ বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ। শিয়াদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, অতীত কর্মপন্থা কিংবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবই তাদের কাছে অজানা। আবার, অনেকের বিশ্বাস, শাফেয়ী, মালেকী বা হাম্বলী মাযহাবের মতো শিয়া মতাদর্শও শরীয়তসম্মত কোনো চিন্তাধারা বুঝি। তারা আদৌ জানেন না শিয়া-সুন্নী মতপার্থক্য কেবল ইসলামের শাখাগত বিষয়েই নয়; বরং মৌলিক তথা আকীদাগত বিষয়েও রয়েছে বিস্তর বিরোধ।

দুই. বাস্তবতা-বিমুখতা

অনেক ভাই আছেন যাদের বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধি নেই। বরাবরই তারা কল্পনাপ্রসূত কথা-বার্তা বলে থাকেন। তাদেরকে সকাল-বিকেল ঐক্যের ডাক দিতে দেখা যায়। বাহ্যত তাদের কথা বেশ ভালোই শোনায়। তারা বলেন, আমরা নিজেরা নিজেদের থেকে কেন দূরে থাকছি!? চলুন না, শিয়া-সুন্নী ভেদাভেদ-মতবিরোধ ভুলে একসঙ্গে বসি, হাতে হাত রেখে চলি; আমাদের সকলেই তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী, তাহলে আর সমস্যা কী?!

তারা আসলে ভুলে যান এভাবে বলা যতটা সহজ, বাস্তবতা মোটেও ততটা সহজ নয়। যেমন দেখুন, কেউ যদি তাওহীত, রিসালত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আবার মদ-জিনাকেও হালাল মনে করে, তবে তাকে কাফেরই বলা হবে। কারণ, এমন সব হারামকে হালাল জ্ঞান করা, কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর—যাতে মুমিন কাফেরে পরিণত হয়।

যদি আমরা এ বিষয়টি বিবেচনায় সামনে রেখে আগাই, তবে শিয়া মতাদর্শে এমন অসংখ্য বিষয় দেখতে পাব, যাতে আলেমদের নির্দেশনার প্রয়োজন পড়বে। শিয়াদের ভয়ংকর বিদআত থেকে প্রকৃত ধর্মীয় বিধান পৃথক করার ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

তিন : অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও বাইরের শত্রুতা

দুঃখজনক হলেও সত্য পৃথিবীর বহু দেশে মুসলিমরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত। ওদিকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, কম্যুনিস্ট, হিন্দু ইত্যাদি জাতীর শত্রুতার কথা তো বলাই বাহুল্য। এজন্য সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন, নতুন করে আর কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হোক।

কিন্তু তাদের এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারত তখন, যখন শিয়াদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকত; আর আমরা নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চাইতাম। অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ লেগেই আছে; তারা আমাদের ওপর রীতিমতো আক্রমণও করছে। এমতাবস্থায় বসে বসে মার খাওয়া আর উদারতা দেখিয়ে চুপ থাকা অক্ষমতা ও কাপুরুষতারই পরিচায়ক।

অনেকে আবার প্রশ্ন করে, 'শিয়ারা কি ইহুদীদের চেয়েও ভয়ংকর?' তাদের প্রশ্ন নিঃসন্দেহে অবান্তর। কেননা এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কেবল মুসলিম উম্মাহর হিম্মত ও সাহস বৃদ্ধির পথে কাঁটা বিছানো, নিজেদের রক্ষা ও মুক্তির সংগ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। তাদের উদ্দেশে আমি বলি, একই সময়ে একাধিক শত্রুর মোকাবিলা করতে কি মুসলিম জাতি অক্ষম? তা ছাড়া সুন্নী মুসলমানরা কি আগে বেড়ে শিয়াদের ওপর কখনো হামলা

করেছে বা হামলার জন্য কোনো ছুঁতো খুঁজেছে? নাকি তাদের পক্ষ থেকেই ক্রমাগত আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে?

সম্মানিত পাঠক! ইতঃপূর্বে আমরা 'শিয়াদের গোড়ার কথা' এবং 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তৃতি' শিরোনামের দুটি প্রবন্ধে শিয়াদের ইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্ট করেছি। সেসব আলোচনায় মুসলিম উম্মাহর প্রতি শিয়াদের হিংস্রতা ও পাশবিকতা কতটা গভীর তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি।

সব মিলিয়ে আমার মনে হয় না তাদের অতীত ও বর্তমানের মাঝে খুব বেশি ব্যবধান আছে। আমি তো জোর দিয়ে বলতে চাই, 'ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে; উত্তরসূরিরা পূর্বসূরিদের পদাঙ্কই অনুসরণ করে।' হাতে গোনা দুয়েকজন ছাড়া সাহাবীদের গোটা প্রজন্মের প্রতিই যারা 'কুধারণা' রাখে, তাদের মাঝে আমরা ঠিক কীভাবে ভালো কিছু আশা করতে পারি? অথচ সাহাবীদের প্রতি মন্দ ধারণা রাখা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خير الناس قرني

'আমার এ প্রজন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ।'[১]

তারা এই হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে, অথচ হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শুধু অতীতেরই নয়, বর্তমান শিয়াদের অবস্থাও যারপরনাই দুঃখজনক...

আমরা এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করব, যা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে আরও শানিত করবে এবং শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আমরা বুঝতে পারব, আমাদের জন্য কোনটি উত্তম—চুপ থাকা, নাকি মুখ খোলা?

---

১. সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩৪৫১; সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৫৩৩; সুনানে তিরমিযী : হাদীস নং ২২২১; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস নং ৩৫৯৪: ইবনে হিব্বান : হাদীস নং ৭২২২

প্রথমত : সাহাবীদের প্রতি অপবাদ ও অভিযোগ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী তথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান যিন-নূরাইন, উম্মাহাতুল মুমিনীন, বিশেষত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিয়ে সাহাবীদের এ পুরো প্রজন্মের প্রতি শিয়াদের অবস্থান কী, তা কারো অজানা নয়। তাদের প্রামাণ্যগ্রন্থ, তথ্যসূত্র ও আকীদা-বিশ্বাস ঘাটলে দেখা যায়, এই মহান প্রজন্মের সকলকে ঢালাওভাবে তারা হয়তো ফাসেক সাব্যস্ত করেছে, আর নয়তো মুরতাদ বলেছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলামের বিধান গোপন ও বিকৃত করার অপরাধে তাঁরা সকলেই গোমরাহ!

পাঠক! এবার আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, এরপরও কি আপনার কাছে উদারপন্থিদের কথা অনুযায়ী ফিতনার ভয়ে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে হয়? বলুন তো, সাহাবীদের মতো শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের প্রতি এমন জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার চেয়ে ভয়ংকর ফিতনা আর কী হতে পারে?

চলুন, মাঝে আমরা একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহাবীর বক্তব্য শুনে আসি—এসব বিষয়ে তিনি কী বলেন। হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

'এই উম্মতের পশ্চাৎবর্তীরা যখন অগ্রবর্তীদের অভিশাপ করবে, তখন যার যা জানা থাকবে, তা যেন সে প্রকাশ করে দেয়। কেননা তখন তা গোপন রাখা, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ ওহী গোপন রাখার নামান্তর।'[১]

বন্ধুগণ! আপনারা কি এই কথাটির অন্তর্নিহীত মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন?

---

১. *আল-মুজামুল আওসাত* : হাদীস নং ৪৩০; *সুনানু ইবনু মাজাহ* : হাদীস নং ২৬৩

সাহাবীদের প্রতি অপবাদ আরোপের বিষয়টি বিগত অন্য কোনো প্রজন্মের প্রতি অপবাদ আরোপের মতো নয়। বিষয়টি এমনও নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকে, 'তাঁরা তো এসব সমালোচনা উপেক্ষা করে জান্নাতের মেহমান হয়ে আছেন, এতে তাঁদের কী এসে যায়।' কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, তাদের অপবাদে কেবল সাহাবীরাই আক্রান্ত হচ্ছেন না; বরং এতে খোদ দীন-ইসলাম নিয়েই সমালোচনার সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

আমার তো সাহাবীদের মাধ্যমেই দীন পেয়েছি। তো, যাদের মাধ্যমে আমরা দীন পেলাম, যদি তাঁদেরকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়, তাঁদের আমল-আখলাক নিয়ে আপত্তি তোলা যায়, তাহলে আমরা কেমন দীনের অনুসরণ করছি?

সহজ কথায় শিয়াদের ওইসব আপত্তি মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় দ্বীন-ইসলামের বিকৃতি স্বীকার করে নেওয়া, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ তথা হাদীসসমূহ সংরক্ষিত না থাকার স্বীকারোক্তি দেওয়া।

আমরা বরং শিয়াদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, 'আপনারা কোন কুরআন পাঠ করেন? এই কুরআনই কি সাহাবীরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেননি? অথচ এখন তাদের ওপরই আপত্তি!? এটাই কি সেই কুরআন নয়, যা প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত করা হয়েছিল? অথচ আপনারা তাঁর খেলাফত নিয়েও বাজে কথা বলেন! আচ্ছা, আপনাদের দাবি অনুযায়ী হাদীস বিকৃত হয়ে থাকলে কুরআন সংরক্ষিত থাকে কীভাবে?!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

'তোমরা অবশ্যই যেন আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে রাখো এবং আমার পর আমার সুপথপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহও আঁকড়ে ধরে রাখো।'[১]

---

১. *সুনানে তিরমিযী* : হাদীস নং ২৬৭৬

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, চার খলীফার সুন্নাহ ইসলামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, যা থেকে দীনের বিচ্ছিন্নতা কল্পনাই করা যায় না। শুধু তাই নয়, হযরত আবু বকর থেকে শুরু করে হযরত উমর, উসমান ও আলী পর্যন্ত খলীফাগণ যে সকল রীতিনীতি ও বিধি-বিধানের ওপর খেলাফত পরিচালনা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের, সকল স্থানের, সকল মুসলমানের জন্য তা অনুসরণীয়, দলীলযোগ্য। তাহলে কোনোভাবেই কি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো রকম বিষোদগার মেনে নেওয়া যেতে পারে?

এজন্য আমাদের মহান পূর্বসূরি আলেমদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সাহাবীদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও তারা বরদাশত করতেন না; কঠোর প্রতিবাদ করতেন। যেমন :

এক. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে দেখো, তবে তার ইসলাম নিয়ে সন্দিহান থেকো।'[১]

দুই. কাজি আবু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফকিহগণের সর্বসম্মত মত এই যে, হালাল মনে করে সাহাবীদের গালি দেওয়া কুফুরি এবং হারাম মনে করে গালি দেওয়া ফাসেকি।'[২]

তিন. আবু যুরআ রাযি. রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাহাবীদের যে গালমন্দ করে, সে যিন্দীক।'[৩]

চার. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবীরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন—হ্যাঁ গুটিকয়েক বাদে, যাদের সংখ্যা বিশের বেশি হবে না—অথবা কেউ এই দাবি করে

১. ইবনু তাইমিয়া রহ. কৃত *আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল*, পৃষ্ঠা : ৫৬৮
২. *আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল*, পৃষ্ঠা : ৫৬৯
৩. খতীব বাগদাদী কৃত *আল-কিফায়াহ ফি ইলমিল রিওয়ায়াহ*, পৃষ্ঠা : ৪৯

যে তাঁদের সকলে ফাসেক, তাহলে ওই লোকের কুফুরির ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই থাকে না।'[১]

কথাগুলো যদিও বেশ কঠিন, কিন্তু সাহাবী-বিদ্বেষী সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। কারণ, যে সাহাবীদের মাধ্যমেই আমরা দীন পেয়েছি, তাঁরা সমালোচিত হলে তো গোটা দীনই প্রশ্নবিদ্ধ। তা ছাড়া তাঁদের শানে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য সুসংবাদ এসেছে, তাই তাঁদের শানে এসব অভিযোগ মেনে নিলে তো স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

যারা বলেন চান আমরা তো কোনো শিয়াকে প্রকাশ্যে সাহাবীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে দেখি না; তিনটি বিষয়ের দিকে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এক. ইসনা আশারিয়া শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, 'সাহাবীরা সকলে মিলে হযরত আলী, আহলে বাইত ও তাদের ইমামদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।' এজন্য ইরান, ইরাক ও লেবাননে এই মতবাদের অনুসারী এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। বলতে গেলে, সাহাবী-বিদ্বেষ ব্যতিরেকে এ মতবাদের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

আর সর্বসম্মত কথা হলো, ইসনা আশারিয়া শিয়াদের কেউই সাহাবীদের প্রতি কোনো রকম সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করে না। তাদের সকলের কাছেই তাঁরা অসম্মানের পাত্র। এমনকি কোনো রকম ধর্মীয় সম্পর্কও তারা তাঁদের সঙ্গে রাখে না।

দুই. শিয়া নেতারা সব সময়ই এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলেন, যেখানে সাহাবীদের প্রতি তাদের মনে চেপে রাখা বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যায়। যদিও মাঝে মাঝে মুখের কথায় মনের ভাব ফুটে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

১. *ইবনু তাইমিয়া রহ. কৃত আস-সারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল*, পৃষ্ঠা : ৫৮৬

وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ

'আর আপনি কথার ধরনেই তাদেরকে চিনে ফেলবেন।'[১]

আল-জাজিরা চ্যানেলে প্রচারিত ড. ইউসুফ কারযাবী ও আকবর হাশিমী রাফসানজানীর[২] 'টক-শো' তো আমরা সকলে দেখেছি। আল্লামা কারযাবী সেখানে সাহাবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনের সম্পর্কে তার মুখ থেকে একটু 'ভালো কথা' বের করতে কী চেষ্টাই না করলেন; কিন্তু তিনি কেবল এড়িয়েই গেলেন, এড়িয়েই গেলেন!

এ ছাড়া একবার যখন ইরানী বিপ্লবের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা খামেনীর কাছে সাহাবীদের গালমন্দ করার হুকুম জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্ট করে এ কথা বলেননি যে, এটি তো ভুল বা হারাম। তিনি বরং অস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন; বলেছেন, মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য বিনষ্টকারী সকল কথাই তো শরীয়তে হারাম।

তো, জনাব খামেনীর কাছে সাহাবীদের গালমন্দ করা মৌলিকভাবে হারাম নয়; মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য বিনষ্টকারী হিসেবে হারাম। তিনি যেন বলতে চান, ঐক্য বিনষ্টের ব্যাপার না থাকলে সাহাবীদের গালি দিতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, তার এই মন্তব্য ২০০৬ সালে ২৩ নভেম্বর মিশরের আল-আহরাম (الأهرام) পত্রিকায় এসেছিল।

তিন. শিয়ারা তাদের অন্যতম আকীদা 'তাকিয়া'-র ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকে। তাকিয়া তাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এটা তাদের কাছে ধর্মের নয়-দশমাংশ। তাকিয়ার অর্থ হলো, নিজেদের আকীদা-বহির্ভূত কোনোকিছু সামনে এলে অবশ্যই তা ঘৃণা করা এবং প্রকাশে সক্ষম হলে তা প্রকাশও করা, তবে অক্ষম হলে মনেই চেপে রাখা।

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৩০

২. ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।–অনুবাদক

শিয়াদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা আলোচনা করেছি; সেখানে দেখেছি, ইরাকে বিদ্যমান উসমানী খেলাফত থেকে শুরু করে মিশর, মরোক্ক ও অন্যান্য সুন্নী অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারকালে সাহাবীদের বিরুদ্ধে কীভাবে তারা প্রকাশ্যে বিষোদগার করেছে। শুধু তাই নয়, এমন গর্হিত কাজকে নিজেদের মূলনীতির অংশ করে নিয়েছে।

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হলো, এ থেকে আশা করি এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রসঙ্গে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চুপ থাকা নিঃসন্দেহে 'বোবা শয়তানি'; যা একসময় বয়ে আনবে দীনের বরবাদি।

দ্বিতীয়ত : শিয়া মতবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা

সন্দেহ নেই, ইসলামী বিশ্বে ঝড়ের বেগে শিয়া মতবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে এ মতবাদ আর এখন ইরাক, ইরান ও লেবাননেই সীমাবদ্ধ নেই; যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, মিশর, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলোতেও।[১] এর চেয়েও আশঙ্কার কথা এই যে, ইদানীং অনেক মুসলিমই শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে মনে করছে, আমি তো শিয়া নই।

এই প্রবন্ধগুলো প্রকাশের পর এমন অসংখ্য চিঠিপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেগুলোর প্রেরকরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী দাবি করলেও নিঃসন্দেহে তারা শিয়া চিন্তাধারায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। তা ছাড়া, সুন্নী দেশগুলোতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলে যেভাবে সাহাবীদের ওপর নগ্ন হামলা ও নোংরা আক্রমণ করা হয়, তাই-বা আমরা ভুলে যাই কী করে!

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এসব জঘন্য ঘটনাগুলোর মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সম্ভবত এক মিশরীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু

১. ১০ই মুহাররম এলে বোঝা যায়, বাংলাদেশেও শিয়াদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।—অনুবাদক

আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ; আর অপরটি ভিন্ন আরেক পত্রিকায় ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে বিষোদগার। ওদিকে এক টেলিভিশন চ্যানেলের জনৈক প্রসিদ্ধ উপস্থাপককে দেখা যায়, প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সে সাহাবীদের দোষচর্চায় লিপ্ত হয়।

এরচেয়ে আরও কঠিন বিষয়—যাতে চুপ থাকার কোনো সুযোগই নেই—তা হলো, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার সুবাদে শিয়াবাদ-সুফিবাদ মিলে মিলে একাকার হয়ে যাওয়া। আমরা জানি, ইসলামী বিশ্বের অনেক দেশেই সুফিবাদের চর্চা রয়েছে, যদিও এসবে রয়েছে বিদআত ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি। আশঙ্কার কথা হলো, শিয়াবাদ ও সুফিদের মাঝে বেশকিছু বিষয়ে গভীর মিল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আহলে বাইতের কবরে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করার বিষয়টি। এ থেকে বোঝা যায়, সুফিবাদের মোড়কে ইসলামী বিশ্বে খুব সহজে শিয়াবাদ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয়ত : ইরাকের বিরাজমান ভয়ংকর পরিস্থিতি

ইরাকে তারা একাধিকবার সুন্নী মুসলিমদের ওপর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব যেন শখের বশে কিংবা ভালো লাগে বলেই তারা করে। 'জাবহাতু উলামায়িল মুসলিমিন আস-সুন্নাহ'-র মহাসচিব হারেস আদ-দারির দেওয়া তথ্যমতে শুধু ২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত শিয়াদের হাতে এক লাখেরও বেশি সুন্নী মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। শিয়া-শাসনের পথ মসৃণ করতে বিভিন্ন স্থানে তারা লাগাতার উচ্ছেদ অভিযানও চালিয়েছে। উপরন্তু এসব অভিযানে ইরাকের বাইরেও বিতাড়িতদের অধিকাংশই সুন্নী মুসলমান। নিঃসন্দেহে এ কারণে জনসংখ্যার গঠনে বিরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করবে; যার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

আচ্ছা, এই সুন্নীদের ওপর এমন হত্যাকাণ্ড চালানোর চেয়ে শিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কি তুলনামূলক বড়ো ফিতনা? যদি তা না হয়, তাহলে কতদিন আর আমরা এভাবে চুপ থাকব? এসব হত্যাকাণ্ডে যে ইরানের পূর্ণ সমর্থন আছে তা কি কারও অজানা?

চতুর্থত : ইরাক নিয়ে ইরানের প্রত্যাশা যথেষ্ট পরিষ্কার

ইতঃপূর্বে ইরান ও ইরাকের মাঝে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা চলমান থেকেছে লাগাতার আট-আটটি বছর। এখন তো একের জন্য অপরের দরোজা খোলা। বিশেষত শিয়াদের তীর্থস্থান হিসেবে ইরাক ধর্মীয়ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইরাকে রয়েছে শিয়াদের ছয়জন ইমামের সমাধি। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমাধি নাজাফে; হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সমাধি কারবালায়; মুসা আল-কাজিম ও মুহাম্মদ আল-জাওয়াদের কবর বাগদাদে; মুহাম্মদ আল-হাদী ও হুসাইন আল-আসকারীর কবর রয়েছে সামাররায়। এ ছাড়া নিতান্তই ধারণাপ্রসূত বলা হয় যে, ইরাকে হযরত আদম, নূহ, হুদ, সালেহ আলাইহিমুস সালামের মতো অসংখ্য নবী-রাসূলের সমাধি রয়েছে। কিন্তু এ তথ্যটি মোটেও সত্য নয়।

ইরাক নিয়ে শিয়াদের যে প্রত্যাশা তাতে ঝুঁকিপূর্ণ আরেকটি দিক হলো, স্বয়ং আমেরিকা তাদের স্বপ্ন পূরণে সমর্থন দিচ্ছে, সাহায্য করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা বরাবরই শিয়াদের পাশে আছে। আর ইরান-আমেরিকা যে হুমকি-ধমকির বিনিময় দেখা যায়, তা কেবলই সাজানো নাটক। কেননা, ইরানে হামলার ব্যাপারে আমেরিকার আদৌ কোনো পরিকল্পনা নেই। যেমনটি আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে 'নিয়ন্ত্রণাধীন শয়তান' শিরোনামের অধীনে আলোচনা করেছি।

কিন্তু মারাত্মক উদ্বেগের বিষয় হলো, তাদের লোভ কেবল ইরাকের পেট্রোল ও অন্যান্য সম্পদের প্রতিই নয়; এমনকি, শিয়াদের সাম্রাজ্যের বিস্তারও এখানে উপলক্ষ্যই মাত্র; বস্তুত, এসব জুলুম অত্যাচার তাদের ধর্মীয় এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত, যা হয়তো আমরা আঁচও করতে পারিনি।

তো, শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে সকল সাহাবী ও তাঁদের অনুসারী আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত বা করে, তারাই সুন্নী। শিয়ারা তাঁদের নাম দিয়েছে 'নাসিব' বা 'নাওয়াসিব'। অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁরা আহলে বাইতের প্রতি তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভক্তি-ভালোবাসা লালন করেন। কিন্তু ওই মিথ্যার ওপর ভিত্তি করেই তারা

সুন্নী-দমন নীতি প্রণয়ন করেছে; বৈধ করে নিয়েছে তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু। যেমন দেখুন,

শিয়াদের বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা জনাব খোমেনী বলেন, 'শক্তিশালী মত হলো, গনিমতের বৈধতা ও খুমুস[১] আবশ্যক হওয়ার দিক থেকে নাসিবরা আহলে হারবের[২] মতোই। বরং আরও নির্ভরযোগ্য মত হলো, তাদের ধন-সম্পদ যেখানে যেভাবে পাওয়া যাবে সেখানে সেভাবেই লুটে নেওয়ার বৈধতা রয়েছে এবং তা থেকে যথারীতি খুমুসও আদায় করতে হবে।'[৩]

শিয়াদের আরেক নেতা মুহাম্মদ সাদিক রুহানীকে ইমাম দ্বাদশের ইমামত অস্বীকারকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞস করা হলে এক অদ্ভুত জবাব দেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চই ইমামত নবুওয়তের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। আমিরুল মুমিনীনকে ইমাম নিযুক্ত করার মাধ্যমে দীন-ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"[৪]

সুতরাং, যে ব্যক্তি ইমাম দ্বাদশের ইমামতের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।'[৫]

আমরা ইতঃপূর্বে 'শিয়াদের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি জনাব খোমেনী তার *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, তাদের ইমামরা মর্যাদার যে স্তরে উন্নীত হয়েছেন, কোনো

---

১. খুমুস : এক-পঞ্চমাংশ। যুদ্ধসংক্রান্ত বিশেষ পরিভাষা। সূরা আল-আনফাল এর ৪১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। –অনুবাদক

২. আহলে হারব : এমন অমুসলিম সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৈধ। –অনুবাদক

৩. ইমাম খোমেনী কৃত *তাহরীরুল ওসিলাহ*: ১/৩৫২

৪. সূরা আল-মায়েদা; আয়াত : ৩

৫. জনাব রুহানীর ফতোয়াটি www.imamrohani.com সাইটে পাওয়া যাবে।

ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলও সে স্তরে পৌঁছতে পারেননি। তাই ইমামদের অস্বীকার করা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।

এ বিশ্বাস থেকেই সুন্নীরা তাদের চোখে কাফের সাব্যস্ত হয়। ফলে ইরাকী সুন্নীদের রক্ত তাদের কাছে হালাল হয়ে যায়; আবশ্যক হয়ে যায় ইরাকের ভূখণ্ড নিজেদের অধীনে নিয়ে আসা। কেননা ইরাকে রয়েছে অসংখ্য পবিত্র স্থান, যা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাফেরদের কবলে।

পঞ্চমত : শিয়াদের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা

শিয়াদের প্রত্যক্ষ হুমকি কেবল ইরাকের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেই নয়; তাদের লালসার দৃষ্টি পড়েছে আশপাশের দেশগুলোর দিকেও। যেমন, বাহরাইনকে তারা ইরানেরই অংশ মনে করে। এ ব্যাপারে ইরানী বিপ্লবের ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিপ্লবের অধিনায়কের দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাধারণ পরিদর্শনের প্রধান জনাব আলী আকবর নাতেক নূরী বলেন, 'বাহরাইন তো ছিল ইরানের চৌদ্দতম রাজ্য। সেখানকার শাসক ছিলেন ইরানের জাতীয় পরামর্শ-সভার একজন প্রতিনিধি।'

সকলেরই জানা, আরব উপসাগরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ এখন ইরানের দখলে। অপরদিকে আমিরাতে তাদের নাগরিক দিনদিন শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে সেখানকার মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ ইরানী। সাথে বিভিন্ন ব্যবসা-কেন্দ্র—বিশেষত, দুবাই এখন তাদের কব্জায়।

সৌদি আরবের পরিস্থিতিও স্থিতিশীল নয়। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের সূচনাকাল থেকে সেখানে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে এসব সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। কাতিফ ও সীহাত নামক এলাকার তাদেরকে বিক্ষোভ পর্যন্ত করতে দেখা গেছে। এরমধ্যে ১৯৭৯ সালের ১৯ নভেম্বরের ঘটনাটি ছিল ভয়ংকর। এ ছাড়া কখনো কখনো পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে, যাতে

বিক্ষোভের মাত্রা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে; এমনকি বাইতুল্লাহয় আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। যেমনটি দেখা গেছে ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ সালের হজের মৌসুমে।

ইরাকে সাদ্দাম হোসাইনের শাসনাবসানের পর ৪৫০ জন শিয়া নেতা সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ আব্দুল্লাহর কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। যাতে মন্ত্রিপরিষদ থেকে শুরু করে কূটনৈতিক, সামরিক ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাপনা, এমনকি পরামর্শসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর উঁচু উঁচু পদ তারা দাবি করেন।

ইরানী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উপদেষ্টা জনাব আলী শামখানী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে আমেরিকা যদি নাক গলিয়েই ফেলে, তাহলে ইরান কেবল তাদের উপসাগর-সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বিনষ্ট করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং সেখানে থাকা তাদের যাবতীয় সামরিক কার্যক্রম ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে ধূলিসাৎ করে দেবে। এবং আরব উপসাগরীয় দেশসমূহে তাদের যতগুলো তেল ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে, সবগুলো ধ্বংস করে দেবে।

২০০৭ সালে ১০ জুন ব্রিটেনের *টাইমস* পত্রিকায় এ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এখানেই কি শেষ? তা কিন্তু মোটেও নয়। এখানো না বলা অনেক কথা রয়েই গেছে।

প্রিয় পাঠক, এই প্রবন্ধে আমরা এমন পাঁচটি দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যা থেকে শিয়া মতবাদের ক্ষতিকর দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ আরও পাঁচটি বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি এই আশঙ্কায় যে, তাড়াহুড়ো করলে হয়তো হক আদায় করে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। এজন্য ঠিক করেছি, 'শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়গুলো তুলে ধরব; কথা বলব এ জটিল বিষয়ে আমাদের সর্বোত্তম পদক্ষেপ হবে কোনটি—তা নিয়ে।

খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহর জন্য শিয়া-সংক্রান্ত বিষয়-আশয় একপাশে রাখার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং

তাদের কথায় কান দেওয়া যাবে না, যারা বিষয়টি একেবারে ছেড়ে দেওয়া কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার দাবি জানায়। কেননা, মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে গুরুতর সকল সমস্যার শীর্ষে রয়েছে শিয়া-সমস্যা।

ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ফিলিস্তিনকে ক্রুসেডারমুক্ত করার আগে মিশরকে উবাইদিয়া শাসন-মুক্ত করেছেন। তখন কিন্তু সুলতান এ কথা বলেননি যে, ক্রুসেডার-দমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ; শিয়াদেরকে পরে দেখে নেওয়া যাবে। কারণ, বিশুদ্ধ আকীদা ও দীনের প্রতি একনিষ্ঠতা ছাড়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। আর সুলতানের মিশন বাস্তবায়নে মিশরবাসীকে তখনই যুক্ত করা সম্ভব হবে, যখন তাদেরকে বিদআতী উবাইদিয়া শাসন থেকে মুক্ত করা যাবে।

সে সময় সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিশরের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বর্তমানে ইরাকের ব্যাপারেও আমাদের পরামর্শ তা-ই। ওই সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য, যে সকল রাষ্ট্রের কাছে শিয়ারা ভীতির কারণ। পরিশেষে আবারও বলতে চাই, ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণের কোনো বিকল্প আমাদের হাতে নেই।

হিযবুল্লাহ-সমাচার : এক

গত কয়েক বছরে মুসলিম উম্মাহর নজরে আসা দল ও সংগঠনগুলোর মাঝে লেবাননের 'হিযবুল্লাহ' অন্যতম। হিযবুল্লাহর মহাসচিব হাসান নসরুল্লাহ বেশ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। আমেরিকার *নিউজউইক* পত্রিকা তার সম্পর্কে লিখেছে, 'ইসলামী বিশ্বে তিনি একজন "ক্যারিশম্যাটিক" ব্যক্তিত্ব; সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তার দ্বারা প্রভাবিত।'

এদিকে দলটির ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে ব্যাপক দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়; দলপতি নাসরুল্লাহকে নিয়েও শোনা যায় নানান গুঞ্জন। অনেকে তার পক্ষে বলতে বলতে একেবারে 'খলীফাতুল মুসলিমীন' বলে ফেলেন; অনেকে আবার তাকে মুসলিম মানতেই নারাজ। দিনশেষে পক্ষে-বিপক্ষে মতের যেন অন্ত নেই।

প্রশ্ন জাগে, বাস্তবতা তাহলে কী? আমরা কি দলটির সফলতায় উচ্ছ্বসিত হব? তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পক্ষাবলম্বন করব? নাকি তাদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করব? নাকি চুপ থাকাই যাদের জীবনাদর্শ, তাদের দলভুক্ত হব? যারা বলে, 'এসব নিয়ে কথা বলার কী দরকার'—আমরাও কি তাদের পথে চলব? নাকি বলব, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্যা বাড়ছে; তাই চুপ থাকার কোনো মানেই হয় না। তা ছাড়া আমরা জানি, সত্য লুকানো তো বোবা শয়তানি।

আমরা আগেও বলেছি, কোনো দল বা মতাদর্শকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সেটির গোড়ার খবর নিতে হয়। সুতরাং এ দলটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সবিস্তার জানতে হবে; খোঁজ নিতে হবে এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা,

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-অবলম্বন কী—সে সম্পর্কে। তবেই কেবল অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে; উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব মিলবে।

ইনশা-আল্লাহ, এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আবেগ ও উপলব্ধিকে বিবেক ও বিবেচনার অধীনে রাখতে চেষ্টা করব। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, বিবেকের বাণী ও আবেগের বার্তার মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।

হিযবুল্লাহর উৎপত্তি

হিযবুল্লাহর উৎপত্তি লেবাননে। জেনে অবাক হবেন, পৃথিবীর বুকে লেবাননের মতো সাম্প্রদায়িক দেশ দ্বিতীয়টি আর নেই। লেবাননে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়ই রয়েছে আঠারোটি। সম্ভবত সেখানকার পার্বত্য প্রকৃতির সুবাদে সকল সম্প্রদায় অনায়াসে নিজ নিজ অবস্থানে টিকে থাকতে পারে।

লেবাননে খ্রিষ্টান, শিয়া, দ্রুজসহ আরও অনেক সম্প্রদায়ের বসবাস। তবে সমগ্র লেবানন জাতি তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে, সুন্নী মুসলিম, ইসনা আশারিয়া শিয়া ও ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে দ্রুজরা; মুসলিম হিসেবে গণ্য হলেও তারা মূলত অমুসলিম।

১৯২০ সালে ফরাসীরা লেবাননে উপনিবেশ স্থাপন করে। শুরু থেকে তাদেরকে এই সাম্প্রদায়িকতা সুপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ অনুরাগী দেখা যায়। অপরদিকে তারা রাষ্ট্রের বড়ো বড়ো পদগুলো রাখতে চাচ্ছিল তাদের মিত্র ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের হাতে।

১৯৪৩ সালে লেবানন পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন হয়; সঙ্গে সম্পন্ন হয় তাদের সংবিধান প্রণয়ণের কাজ। নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যথাক্রমে ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান, সুন্নী মুসলিম ও শিয়া সম্প্রদায়কে। আইনটি ১৯৪৩ সালে প্রণিত হলেও প্রয়োগ আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সাল থেকে। এর আগে রাষ্ট্রীয় সকল পদে ম্যারোনাইটরাই ছিল সর্বেসর্বা।

এমন সংবেদনশীল সাম্প্রদায়িকতার কারণেই সম্ভবত লেবাননীরা একটি নির্মোহ আদমশুমারি থেকে সব সময় পিছিয়ে থেকেছে;

জনসংখ্যার সঠিক হিসেব বের করতে কখনো আগ্রহী হয়নি। তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী লেবাননের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬ জন সুন্নী, ২৬ জন শিয়া এবং ২২ জন ম্যারোনাইট। এরপর রয়েছে দ্রুজদের অবস্থান; তারা সংখ্যায় শতকরা ৫ জন বা ৬ জন।

এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক সম্প্রদায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট। উপরন্তু শিয়াদের অবস্থান দক্ষিণ লেবানন ও বিকা উপত্যকায়; সুন্নীদের বসবাস উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল এবং উপকূলীয় শহর তথা, বৈরুত, ত্রিপলি ও সাইদাতে; আর ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের আধিপত্য জাবালু লুবনান বা মাউন্ট লেবানন ও পূর্ব বৈরুতে।

গত কয়েক দশক ধরে ইহুদীদের সঙ্গে শিয়াদের সংঘাত। কিন্তু কেন? সম্ভবত দক্ষিণাঞ্চলে তাদের বসবাসের বিষয়টি বিবেচনায় নিলেই এই প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ চাইলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারব, এটি মোটেও বিশ্বাসগত সংঘর্ষ ছিল না; এতে ছিল না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ন্যূনতম উদ্দেশ্য; কিংবা ফিলিস্তিনীদের স্বাধীন করার লক্ষ্য। বরং উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলোকে রক্ষা করা। তাই নিরুপায় হয়েই তাদেরকে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তা না হলে, ঘটনা একদম 'ইউটার্ন' নিয়ে ফেলত।

আর এ বিষয়ে আমারা নিশ্চিত যে, ইহুদীরা হামলাটা সুন্নীদের ওপর করলে শিয়ারা নিজেদের জায়গা থেকে এক চুলও নড়ত না।

মুসা আস-সদর

এবার আমরা ঘটনার মূলে চলে যাচ্ছি... লেবাননে ফ্রান্স ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের তুলনায় শিয়া ও সুন্নীরা একরকম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবেই বসবাস করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এ উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মোন্নতি-

বিধানের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়। বিশেষত পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এ ব্যাপারে তাদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সে সময় সুন্নীদের হাল ধরার মতো কেউ ছিল না। বিশেষত সমগ্র আরববিশ্ব যখন সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল, এরা ছিল তখন নেতৃত্বহারা। ঠিক একই সময়ে শিয়াদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। ভাগ্যক্রমে তারা তখন এমন একজনকে পেয়ে যায়, যিনি তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি লেবাননে এসে একজন প্রভাবশালী শিয়া হিসেবে লেবানন-মানচিত্রে আপন স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। তিনি হলেন মুসা আস-সদর। সময়টি ছিল ১৯৫৯ সালের দিকে।

মূসা আস-সদর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের কুম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি 'ইসনা আশারিয়া মতাদর্শ' বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে কুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ ও তর্কশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরও পড়াশোনার উদ্দেশে ইরাকের নাজাফ শহরে গমন করেন। সেখানে বিশিষ্ট শিয়া পণ্ডিত মুহসিন আল-হাকিম ও আবুল কাসিম আল খুইর কাছে উচ্চতর পাঠ সমাপ্ত করেন। এরপর ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চলে যান লেবাননে। এবং সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

লেবানন গমনকালে মুসার সঙ্গী

লেবানন গমনের সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূসা আস-সদরের সফরসঙ্গী ছিল। প্রথমটি হলো বিশেষ ধর্মীয় প্রকল্প অর্থাৎ, ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের বিকৃত চেতনা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নিকৃষ্ট বিদআত ছড়িয়ে লেবাননকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। 'শিয়াদের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে আমরা তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, আকীদা ও চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। আসলে, লেবাননী শিয়ারা তখন পর্যন্ত সেই অর্থে ধার্মিক ছিল না। ধর্মকর্ম খুব একটা বুঝতও না। যাকে বলে নামমাত্র শিয়া। তারা এ মতাদর্শের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই রাখত না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো অঢেল সম্পদ, যা তার প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ মসৃণ করার ক্ষেত্রে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর জানা কথা, নেতৃস্থানীয় শিয়ারা বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকেন। কেননা সাধারণ শিয়ারা তাদের আয়ের বিশ-শতাংশ আহলে বাইতের সদস্য ভেবে তাদের হাতে অর্পণ করে। প্রদত্ত এ সম্পদ নেতারা যাচ্ছেতাই করতে পারেন। বস্তুত, এই অর্থ ব্যবহার করেই তারা যাবতীয় কলকাঠি নাড়েন, গড়েন দৈত্যাকার অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

সুন্নী শাসনের বিরুদ্ধে শিয়াদের বিদ্রোহ

সমসাময়িক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক চেতনা থেকেই মূলত শিয়া মতবাদের উৎপত্তি। শুরু থেকেই শিয়াদের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার এবং শাসনক্ষমতার সুপ্রতিষ্ঠা। এতে সুন্নীদের সঙ্গে তাদের যতই সংঘাত হোক না কেন। ইতিহাসের নানান বাঁকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের এ স্বপ্ন পূরণও হয়েছে। তখন অধীনস্থরা দেখেছে এ সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক লীলাখেলা কতটা জঘন্য হতে পারে। যদিও খ্রিষ্টীয় আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাফাভিদ শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে তাদের স্বৈরশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে; দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকে তাদের সকল প্রকল্প ও পরিকল্পনা।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকে তাদের সেই আগ্রাসি মনোভাব আবার জাগ্রত হয়। আবার তারা একটি আলাদা সাম্রাজ্যে তাদের ভ্রান্ত ও বিকৃত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়। বরাবরের মতো এবারও তাদেরকে বেশ বেপরোয়া দেখা যায়। প্রয়োজনে তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্তও নেয়। কাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্যের জন্য তিনটি রাষ্ট্রের নাম প্রস্তাবনায় উঠে আসে। সেগুলো হলো ইরান, ইরাক ও লেবানন। এ দেশগুলোতে শিয়াদের বসবাস আগে থেকেই ছিল চোখে পড়ার মতো। যা ছিল তাদের জন্য অন্যতম ইতিবাচক দিক।

শিয়া লবি এই তিনটির কোনোটি কিংবা সবকটিতেই শিয়া শাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত কিছু

লোককে উল্লিখিত দেশসমূহে প্রেরণ করা হয়। এদিকে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র ইরানে কিছু লোক কাজ শুরু করে; ওদিকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ইরাকে একই উদ্দেশ্যে আরও কিছু লোক কাজে লেগে যায়; আর লেবাননে পাঠানো হয় মুসা আস-সদরকে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ছিল বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে কয়েক দশক পরে হলেও যে তা সফলতার মুখ দেখবে, তা ছিল অনেকটা নিশ্চিত। সময় যতই লাগুক, গুরুত্বপূর্ণ তো হলো সফলতা। তা ছাড়া শিয়াদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্য তথা, বুওয়াইহিয়া, উবাইদিয়া বা কথিত ফাতিমীসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলো তো এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

এসব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে সাধারণত নিপীড়িত ও অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করা হয়েছে। শিয়া নেতারা প্রথমে ধনী ও সম্পদশালীদের বিরুদ্ধে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। এরপর সেই আগুনে ঘি ঢেলে উভয় শ্রেণিকে নিয়ে গেছে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে। অবশেষে শিয়াজনতার আবেগানুভূতি কাজে লাগিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে প্রতিটি শিয়া রাষ্ট্র।

ইতিহাসের পাতায় বারবার পাঠ করে আসা ঘটনা আমরা ইরানের ভূমিতে ঘটতেই দেখলাম। সে বিষয়ে আল্লাহ চাইলে সময়মতো সবিস্তার আলোচনা করব। এখন লক্ষ করার বিষয় হলো, ইদানীং ইরাক ও লেবাননে অতীতের সেই পদক্ষেপগুলোই নিতে দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্টভাবে। সন্দেহ নেই, এ দুটি দেশে তাদের পরিকল্পনা সফল হলে পরবর্তী টার্গেট হবে সিরিয়া, কুয়েত, বাহরাইন ও সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল।

চারপাশে কী ঘটছে এবং ঘটতে যাচ্ছে তা মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

ফিরছি লেবানন-প্রসঙ্গে... পূর্বোক্ত শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকেই মুসা আস-সদরকে লেবাননে পাঠানো হয়। তাকে নির্বাচনের

পেছনে বেশকিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য একটি হলো লেবাননীদের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং আরবী ও ফার্সী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা জনাব খোমেনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল নিরবচ্ছিন্ন। এমনকি তাদের মাঝে রাজনৈতিক সম্পর্কের চেয়ে পারিবারিক সম্পর্কই ছিল অধিক ঘনিষ্ঠ। একদিকে খোমেনীপুত্র আহমাদ খোমেনী বিয়ে করেছেন মুসা আস-সদরের ভাগ্নীকে; অপরদিকে মুসাপুত্র বিয়ে করেছেন খোমেনীর নাতিনকে। আবার মুস্তফা খোমেনী ও মুসা আস-সদরের মাঝে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে শিয়াদের ঘনবসতি। এজন্য মুসা আস-সদর সেখানেই বসবাস শুরু করেন। শুরুতে তিনি খোলামেলাভাবে ধর্মীকর্মের দিকে না গিয়ে নিছক উন্নয়নমূলক সামাজিক কার্মকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হন। হতদরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করনে নানা রকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গড়ে তোলেন একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসাকেন্দ্র। এরপর তিনি একটু একটু অগ্রসর হতে থাকেন মূল লক্ষ্যের দিকে; প্রকাশ করতে থাকেন হৃদয়ে ধারণকৃত চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাস।

প্রথমে তিনি শিয়াদের মাঝে ইসনা আশারিয়া মতাদর্শ অনুযায়ী বিচারকার্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'জাফরী আদালত'[১] নামে এক বিশেষ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। লেবাননের সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুবাদে এ কাজটি তিনি খুব সহজেই করতে সক্ষম হন। তা ছাড়া সরকার ও সামরিক বাহিনীর সীমাহীন উদাসীনতা ও দুর্বলতাও তার ইচ্ছা পূরণে সঙ্গ দিয়েছিল সমানভাবে।

মুসা আস-সদর ছিলেন অসামান্য চাতুর্যের অধিকারী; স্বার্থ হাসিলের জন্য ঝোঁপ বুঝে কোপ মারায় পারদর্শী। শুরুতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লেবাননে এখন সবচেয়ে ক্ষমতাধর সম্প্রদায় ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান। আর তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্নী মুসলমান। তিনি এ-ও

---

১. Chiia Tribunal - Courts (المحاكم الجعفرية)

জানতেন, এ যুগে অল্প কিছু ছাড়া অধিকাংশ সুন্নীদের অবস্থান আহলুস সুন্নাহর নীতি-আদর্শ এবং দীনের বিধি-বিধান থেকে বহু দূরে। মুসলিমরা এখন নিজেদের স্বকীয়তা বিকিয়ে দিয়ে সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তীরে তরি ভেড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মূসা আস-সদর খ্রিষ্টান ম্যারোনাইটদের গা ঘেঁষলেন। এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কেননা শিয়া মতবাদের জন্মই হয়েছিল সুন্নী মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য, ইসলামী খেলাফতের সোনালি অতীত প্রত্যাখ্যান করার জন্য, ইসলামী বিশ্বের সকল সুন্নী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। এ কারণে তাদের মৌলিক চিন্তাধারাই আহলুস সুন্নাহর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

মূসা আস-সদর লেবাননের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান চার্লস হিলোর[১] দারস্থ হন। মুসলিম দাবিদার হয়েও তিনি খ্রিষ্টানদের কাছে যান; অথচ মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধির জন্য সুন্নী নেতাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ তিনি করেননি। সুন্নীদের বিপক্ষে চার্লস হিলোর জন্য মূসা আস-সদর উপযুক্ত মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

চার্লস হিলো মূসা আস-সদরকে কাছে টেনে নেন, উৎসাহিত করেন। এবং ১৯৬৭ সালে তিনি লেবাননী শিয়াদের কল্যাণে 'ইসলামী শিয়া সর্বোচ্চ পরিষদ'[২] গঠনের অনুমতি প্রদান করেন।

শুধু তাই নয়, চার্লস হিলো ৭২/৭৬ ধারায় একটি নতুন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সম্মত হন; যাতে উল্লেখ করা হয় যে শিয়া পরিষদ তাদের নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান ও ফতোয়ার ব্যাপারে অন্যান্য শিয়া রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে লেবাননে বিধি-নিষেধ জারির প্রয়োজন পড়বে না।

পর্যায়ক্রমে ১৯৬৯ সালে এই পরিষদ গঠিত হয়। এবং মহাসচিবের দায়িত্ব অর্পিত হয় মূসা আস-সদরের কাঁধে। ১৯৭০ সালে পরিষদটি

---

১. Charles Helou

২. Supreme Islamic Shia Council (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى)

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের শিয়াদের কল্যাণার্থে দশ মিলিয়ন ডলার খরচের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

মূসা আস-সদর আমেরিকার কাছেও নিজেকে সঁপে দেন। উদাহরণত, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে উল্লেখ করেন যে, লেবাননের শিয়া যুবসমাজকে নাসিরবাদ[১] থেকে বিমুখ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমেরিকার সাথে তার এই দহরম-মহরমের খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে খোমেনীর কাছের লোকেরা তার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। আসলে খোমেনীর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ছিল তখন দা-মাছ। কারণ, আমেরিকা তখন ছিল ইরানী শাহের কট্টর সমর্থক।

১৯৭০ সালের ঘটনার জন্য মূসা আস-সদর মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। সে সময় আকস্মিকভাবে জর্ডানে আশ্রিত ফিলিস্তিনী শরণার্থীরা গণহত্যার শিকার হয়। নৃশংস এ ঘটনাটি 'কালো সেপ্টেম্বর'[২] নাম পরিচিত। এরপর 'ফাতাহ'-র[৩] উদ্যোগে বেঁচে যাওয়া শরণার্থীদের লেবাননে পাঠানো হয়। তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয় ফিলিস্তিন সীমান্ত ঘেঁষে দক্ষিণ লেবাননে।

শিয়াদের কাছে এ বিষয়টি মোটেও ভালো লাগেনি। কেননা, ফিলিস্তিনীরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারী। আর এজন্য হয়তো দেখা যাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হচ্ছে। জেনে রাখা ভালো, 'ফাতাহ'-ও ছিল ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে বিচ্যুত, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রোগে রোগাক্রান্ত।

এমতাবস্থায়ও মূসা আস-সদর ফাতাহ থেকে ঠিকই উপকৃত হয়েছেন; স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছেন।

---

১. নাসিরবাদ (التيار الناصري) : মিশরের জামাল আবদুন নাসিরের চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক আরব জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ। –অনুবাদক

২. Black September (أيلول الأسود)

৩. ফাতাহ বা فتح এর পূর্ণ নাম : حركة التحرير الوطني الفلسطيني বা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন। এটি ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালে গঠিত হয়। –অনুবাদক

যেন পরবর্তী সময়ে ফাতাহ শিয়াদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। আর এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এমন এক সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা, যা লেবানন নিয়ে তার সকল স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হয়।

অপরদিকে ফাতাহও সে সময় এমন এক মিত্রের সন্ধানে ছিল, যে কি-না কম্যুনিস্ট ও তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করবে। সব মিলিয়ে উভয়ের মাঝে স্বার্থের ভিত্তিতে এক দারুণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে সিরিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি হাফিজ আল-আসাদ। তিনি ছিলেন আলাওয়ী নুসায়েরী[১] সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে এ সম্প্রদায়টিকে মুসলিম বলা হয় ঠিক, কিন্তু তারা মুসলিম নয়। কারণ, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তারা ইলাহা বা প্রভু জ্ঞান করে।

এ সময় মূসা আস-সদর তড়িঘড়ি করে একটি ফতোয়া জারি করেন; যাতে আলাওয়ী সম্প্রদায়কে শিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই সুবাদে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদকে মুসলিম মনে করা শুরু হয়।

মূসা আস-সদরের এই ফতোয়া তাকে সিরিয়া সরকারের কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন করে তোলে। এরপর তিনি হাফিজ আল-আসাদ ও ইরানী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের মাঝে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করেন। এবার হাফিজ আল-আসাদ ইরানী শাহের বিরুদ্ধে চলা বিদ্রোহের পক্ষে অবস্থান নেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে শত্রুতার জের ধরে তিনি ইরানী বিপ্লবের পর ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানের পক্ষাবলম্বন করেন।

এভাবেই মূসা আস-সদর একটি নতুন শিয়া রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সক্ষম হন। আর এ কাজে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় (শিয়া) নেতৃবৃন্দ তাকে সাহায্য করেন, সমর্থন জানান। তাদের মাঝে জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সমর্থনে

---

১. العلوية النصيرة

আরও ছিল লেবাননের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, সিরীয় ও মার্কিন সরকার; এমনকি সুন্নী নামধারী ফাতাহও।

১৯৭৫ সালে মূসা আস-সদর 'হারকাতুল মাহরূমীন' বা 'সুবিধা-বঞ্চিতদের সংগ্রাম'[১] নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূল এজেন্ডায় সুবিধাবঞ্চিতদের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার কথা বলা হয়। এ জন্য দক্ষিণাঞ্চলের বহু খ্রিষ্টান তাতে যোগ দেয়। তাদের ধারণা ছিল, সংগঠনটি হয়তো সত্যিই দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন দেখা যায়, শিয়াদের স্বার্থরক্ষাই এর একমাত্র লক্ষ্য, তখন তারা কেটে পড়ে। এরপর এ সংগঠনের কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে মূসা আস-সদর নতজানু লেবানন সরকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফাতাহের মহাসচিব ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মূসা আস-সদর হরকাতুল মাহরূমীনের অধীনে একটি সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সংগঠনের নাম দেন 'আফওয়াজুল মুকাওয়ামাহ আল-লুবনানিয়া' বা 'লেবানন প্রতিরক্ষা বাহিনী'[২]। সংক্ষেপে এটি 'হারকাতু আমাল' বা 'আশার আন্দোলন'[৩] নামে পরিচিত হতে থাকে। সঙ্গত কারণে মূসা আস-সদর নিজেই ছিলেন এর প্রধান।

এসব সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর মূসা আস-সদর ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন; শিয়া অধ্যুষিত দক্ষিণ লেবানন থেকে সুন্নীদেরকে উৎখাত করতে উঠেপড়ে লাগেন। একপর্যায়ে হারকাতু আমাল ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের নামে চলতে থাকা এ নির্যাতন 'হারবুল মুখায়্যামাত' 'শিবিরের যুদ্ধ'[৪] নামে প্রসিদ্ধ।

---

১. Movement of the Dispossessed (حركة المحرومين)

২. Lebanese Resistance Regiments (أفواج المقاومة اللبنانية)

৩. Hope Movement (حركة أمل)

৪. War of the Camps (حرب المخيمات)

১৯৭৫ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। অভ্যন্তরীণ দলগুলো এই যুদ্ধে একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যদিও তাতে বহিরাগত দলের সংখ্যাই ছিল বেশি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে আশা করি সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একজন মূসা এবং বহুমুখী শত্রুতা

মূসা আস-সদর 'সর্বোচ্চ শিয়া পরিষদ' এবং 'হারকাতু আমাল' প্রতিষ্ঠার পর সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন; যা অনেকের মনেই তার প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়। যদিও এর পেছনের মূল কারণ ছিল অকুতোভয় মূসার ক্ষমতার প্রদর্শনী। নিজ ইচ্ছার প্রতিকূলে কিছু ঘটলে কিংবা অনকূলে না ঘটলেই মূসা তার বাহিনীকে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন। একপর্যায়ে তিনি জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কিছু কাজের সমালোচনা পর্যন্ত করেন। এমনকি, যে মুরুব্বিরা তাকে লেবানন পাঠিয়েছিলেন তাদের উপেক্ষা করে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উঠাবসা শুরু করেন। এতে তারা তার ওপর অসন্তুষ্ট হন, বিশেষত যখন তিনি ইরানের শাহের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন এবং ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বারোজন ধর্মীয় নেতার মুক্তি কামনা করেন। জনাব খোমেনী এ কারণে তাকে আন্তর্জাতিক শিয়া নীতি ভঙ্গ করা এবং ইরানী বিপ্লবের শত্রু শাহের সঙ্গে আঁতাতের দায়ে অভিযুক্ত করেন।

১৯৭৮ সালে সিরিয়া-সদর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। মূল কারণ হলো, ১৯৭৭ সালে সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ইসরায়েল সফর করেন। এ কারণে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও আমেরিকার চক্ষুশূলে পরিণত হন। সিরীয় সৈন্যরা যেহেতু তখনও লেবাননে অবস্থান করছিল, তাই তিনি চাচ্ছিলেন লেবানন যেন তার পাশে দাঁড়ায়। পাশাপাশি এ-ও কামনা করছিলেন যে, লেবানন যেন সিরিয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো মিত্র গ্রহণ না করে।

কিন্তু সিরিয়ার সক্ষমতা ও দুর্বলতার বিষয়-আশয় মাথায় থাকায় মূসা আস-সদর তার এই আহ্বান উপেক্ষা করে আরববিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

জোরদার করার উদ্যোগ নেয়। সুতরাং মূসা আস-সদর প্রথমে কুয়েত এবং পরে আলজেরিয়া সফর করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে লিবিয়ার উদ্দেশে বের হন। এরই মধ্যে ঘটে যায় এক মহাকাণ্ড। লিবিয়া সরকার ঘোষণা করে যে মূসা আস-সদর ২৫ আগস্ট লিবিয়া ছেড়ে গেছেন; অথচ এরপর পৃথিবীর কোথাও আর তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেওয়ার মতো ঘটনা। মূসা আস-সদর তো কোনো শিশু নন যে তিনি বিমানবন্দরে দিকভ্রান্ত হবেন, কোনো আগন্তুকও নন যে দেশের পথঘাট না চিনে হারিয়ে যাবেন। বস্তুত তাকে গুম করে হত্যার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল খুবই সন্তর্পণে, লোকচক্ষুর আড়ালে।

সে সময় মূসার জন্য ওত পেতে থাকা শত্রুর অভাব ছিল না। তাই নিখোঁজের পরপরই সন্দেহের আঙুল ওঠে অনেকের দিকে। তাদের সর্বাগ্রে ছিল এ ঘটনার এক বছর পর ঘটা ইরানী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ। কেননা, তারা এমন কোনো ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বকে সহ্য করতে পারত না, যে তাদেরকে বাদ দিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি নতুন শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করবে এবং খোমেনীর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

এ ছাড়া সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষুব্ধ করার বিষয়টিও ছিল তার জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক। কেননা, তিনি তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে রক্ত নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন, যা সকলেরই জানা। তা ছাড়া, খোদ লিবিয়ার সঙ্গেই ইরানী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের গভীর সম্পর্ক ছিল। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানের প্রতি লিবিয়ার সমর্থনই তা প্রমাণ করে।

মূসা আস-সদরের ইন্তেকালে লেবাননের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো যার যার হিসসা বুঝে নেয়। অতঃপর চলমান গৃহযুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

আকস্মিকভাবে মূসা আস-সদরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সকলকে মারাত্মক ধাঁধায় ফেলে দেয়; রাজনীতিকরা এর উত্তর খুঁজতে মরিয়া হয়ে ওঠেন; কিন্তু নিশ্চিত করে কারও পক্ষেই কিছু বলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

ভাবনার বিষয় হলো, মূসা আস-সদর চলে গেলেও তার পেছনে রেখে গেছেন এক অগ্নিগর্ভ ভূমি। রেখে গেছেন নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনী, যেটি তার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাবে। আরও রেখে গেছেন সর্বোচ্চ শিয়া পরিষদে একটি শূন্য পদ।

এর ঠিক এক বছর পর ইরানী বিপ্লব সংঘটিত হয়; যাতে ইরানী শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। এবং চার বছর পর ইহুদীরা দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ করে।

এতসব উত্থান-পতন পেরিয়ে, কালের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় প্রসিদ্ধ শিয়া সংগঠন হিযবুল্লাহ। উদ্দেশ্য, মূসা আস-সদরের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা। তবে সেটা নিশ্চয় ইরানের সমর্থন ও সহায়তায়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়—এসব কীভাবে সম্ভব? আসল উদ্দেশ্য তাহলে কী? দক্ষিণ লেবাননে অবস্থানরত ফিলিস্তিনীদের ব্যাপারে শিয়াদের অবস্থানই-বা কী? কীভাবে হিযবুল্লাহ এতটা আগে বাড়ল? কে এই হাসান নাসরুল্লাহ? কী তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা?

হিযবুল্লাহ-সমাচার : দুই

কোনো বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া; কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারা সহজ কথা নয়; কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেক ভাই এ কাজটি এড়িয়ে যান। তারা যে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই চেপে রাখা তথ্য-উপাত্ত বের করে আনতে পারেন; পারেন শেকড় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে, গোড়ার খবর নিতে, সেদিকে তাদের কোনোই ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ এই অবহেলা ও উদাসীনতার ফলে একসময় ভয়ংকর সঙ্কট তৈরি হয়, মহাবিপদ নেমে আসে; তখন যা করার থাকে, তা কোনো কাজে আসে না।

লেবাননে শিয়াদের হিযবুল্লাহ নামক সংগঠনের উৎপত্তি-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম যে তথ্যটি তুলে ধরার ছিল তা করার পর, আমরা আবার আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। আমি জানি, আমার চলার এ পথ কতটা বন্ধুর, কতটা কণ্টকাকীর্ণ। এ-ও জানা, মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের যে উদ্যোগ আমি নিয়েছি, এ কারণে আমার দিকে ওই সকল আবেগী মুসলমানদের তূণীর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানের তির আসতে থাকবে, যারা মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তিকালে এসেও 'যার-তার' সফলতা দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে; তাদের হাতে ভেবে দেখার মতো সময় নেই—এ সফলতা সেই শিয়া সম্প্রদায়ের—যারা সাহাবীদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁদের সমালোচনা করা নিজেদের অধিকার মনে করে, বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদগার করতে থাকে।

আমি জানি, এসব কারণে আমি ওই সকল শিয়াদেরও দুর্ব্যবহারের শিকার হব, যারা সুন্নী লেখকদেরকে এসব বিষয় এড়িয়ে যেতে উৎসাহিত করেন, এসব নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেন। তারা চান, সুন্নীদের কলমের কালি কেবল আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যয় হোক; আর এই সুযোগে শিয়ারা সকলের অগোচরে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাক, মুসলিম উম্মাহ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাক অতীতের বুওয়াহিয়া সাম্রাজ্যের মতো কোনো সাম্রাজ্য কিংবা তারচেয়ে বড়ো।

মূসা-পরবর্তী 'আমালে' বিভক্তি

আমরা জেনেছি, মূসা আস-সদর প্রথমে ইরানের কুম এবং পরে ইরাকের নাজাফ শহর থেকে লেবানন গিয়ে শিয়াদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের অধীনে সমবেত করে স্বতন্ত্র শিয়া রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। তিনি এ সংগঠনের ধর্মীয় দিকটি বিবেচনায় রেখে ১৯৬৯ সালে 'সর্বোচ্চ শিয়া পরিষদ' গঠন করেন; সাথে সামরিক সক্ষমতার বিষয়টি খেয়াল করে 'হারকাতু আমাল' প্রতিষ্ঠা করেন। 'আমাল' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'আফওয়াজুল মুকাওমাহ আল-লুবনানিয়্যাহ' শব্দসমষ্টির প্রথম বর্ণগুলো দ্বারা।

মূসা আস-সদর ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান, আমেরিকা ও সিরিয়ার সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এদিকে খোমেনীর নেতৃত্বে যারা তাকে লেবাননে পাঠিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। উল্লেখ্য, খোমেনীর অবস্থান তখন ছিল ইরাকে।

ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ামাত্রই মূসা আস-সদরের সাঙ্গে থাকা সন্ধিগুলো বিচ্ছেদ হতে থাকে। ইরানী বিপ্লবের নেতাদের সঙ্গেও দেখা দেয় মতবিরোধ। এ ছাড়া তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হাফিজ আল-আসাদের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আর এ সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৮ সালের ২৫ আগস্ট। লিবিয়া সফরে গিয়ে ফেরার পথে মুসা না ফেরার দেশে চলে যান।

মূসা আস-সদর চলে যান, রেখে যান এক বিশাল শূন্যতা। তার অনুপস্থিতিতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়; যদিও তৎক্ষণাৎ শিয়ারা কিছুটা গুছিয়ে আনার চেষ্টা করে। মূসার পর সর্বোচ্চ শিয়া পরিষদের দায়িত্ব চাপে আবদুল আমীর কাবালানের কাঁধে। আগে তিনি ছিলেন মূসার নায়েব বা সহকারী। মূসার অবর্তমানেও তিনি এ পদেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এরপর একদিকে লেবাননী শিয়া মুরব্বিদের মাঝে জনাব হুসাইন ফজলুল্লাহ সর্বোচ্চ ধর্মীয় অভিভাবক হিবেবে স্বীকৃতি পান। অপর দিকে শিয়াদের প্রসিদ্ধ সামরিক সংগঠন হারকাতু আমালে কোন্দল সৃষ্টি হয়; এবং একপর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথম ভাগের শিয়ারা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত। তারা ইসনা আশারিয়া মতাদর্শ খুব একটা পছন্দ করত না। লেবানন-বহির্ভূত কোনো ধর্মীয় নেতা বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও তাদের ভালো লাগত না। জাতীয়তাবাদী চেতনায় তারা ছিল উজ্জীবিত। আর তাদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রসিদ্ধ লেবাননী নেতা নাবীহ বারী।

দ্বিতীয় ভাগের শিয়ারা ছিল মূসা আস-সদরের পরিপূর্ণ অনুসারী। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন একটি শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা, যেখানে তাদের বিকৃত আকীদা ও চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যদিও সেজন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। তাদের পরিকল্পনা ছিল সাধ্যানুযায়ী নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা এবং কৌশলে ইরানী বিপ্লবের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারা তখন নেতৃত্ব-সংকটে ভুগছিল।

আল-মুসাভী, নাসরুল্লাহ এবং ইরানী পরিকল্পনা

লেবাননী শিয়াদের এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে ইরাকের নাজাফ থেকে শিয়া আকীদায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী দুজনকে সেখানে পাঠানো হয়। মূসা আস-সদরের মতাদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণে তাদের একনিষ্ঠতা ছিল সর্বাগ্রে। তারা হলেন আব্বাস আল-মুসাভী এবং হাসান নাসরুল্লাহ।

লেবাননে গিয়ে তারা অতিদ্রুত হারকাতু আমালে যোগ দেন এবং কেন্দ্রীয় দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তখন হাসান নাসরুল্লাহর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর।

জনাব খোমেনী ১৯৭৮ সালে ইরাক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে প্যারিসে আশ্রয় নেন। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের সময় ইরানের শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং জনাব খোমেনী প্যারিস থেকে তেহরানে ফিরে এসে ইরানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি সবকিছু ঢেলে সাজাতে শুরু করেন। এ সময় তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার পথ থেকে সড়ে দাঁড়ায় এবং তিনিও পরবর্তী বিপ্লবে সহযোগী হতে পারে এমন লোকদের কাছে ভালো সাজতে চেষ্টা করেন। এভাবে একটু একটু করে তিনি ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেন। এরপর আর তিনি পবিত্র নগরী কুমে ফিরে যাননি, যেমনটি জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল; বরং ইরানের রাজধানী তেহরানেই থেকে গেছেন।

ইরানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে খোমেনী নজর দেন লেবানন ও ইরাকের দিকে। এ দুটি ভূখণ্ডে তখন শিয়াদের বসবাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এজন্য রাষ্ট্রদুটি এই অঞ্চলে বৃহত্তর শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

ইরাকে তখন মারাত্মক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল; যদিও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন সবকিছু শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারগুলো ঘটছিল খোমেনীর চোখের সামনেই; কারণ তাকে ইরাক ছেড়ে প্যারিস যেতে বাধ্য করার পূর্বে তিনি পূর্ণ চৌদ্দটি বছর ইরাকেই কাটিয়েছেন। এ কারণে খুব ভালো করে জানা ছিল ইরাকে অভ্যন্তরীণ শিয়া আন্দোলন সাদ্দাম সরকারের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; তাই তিনি সামরিক উপায়ে সমাধানের পথ বেছে নেন।

এরপর ১৯৮০ সালে ইরানী বিপ্লবের পর মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি ইরাক-সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হামলা চালাতে নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটানো এবং ইরাকী

শিয়াদেরকে ক্ষমতায় বসানো, যাতে খোমেনীর বৃহত্তর শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম হবে।

অপরদিকে দূরবর্তী দেশ লেবানন বিচিত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ে ভরা। সুতরাং সেখানে এমন কিছু লোক প্রস্তুত করতে হবে, যারা হবে খোমেনীর প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত এবং তার চিন্তাধারায় আপাদমস্তক প্রভাবিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই জনাব খোমেনী সেখানে থাকা দুই শিয়া নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যারা ছিলেন ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারী এবং খোমেনীর ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি তথা, 'বিলায়াতুল ফাকীহ'[১] আকীদায় বিশ্বাসী। এরা হলেন আব্বাস আল-মুসাভী এবং হাসান নাসরুল্লাহ।

এরপর থেকে ইরান তাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করে। যদিও তখন হারকাতু আমালের নেতৃত্ব ছিল নাবীহ বারির হাতে, যিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষপাতি।

১৯৮১ সালে হারকাতু আমালের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার সমাধান করা। সমস্যাগুলো বেধেছিল শিয়া নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষমতার বিস্তার নিয়ে। এই সম্মেলনে নাবীহ বারিকে হারকাতু আমালের প্রধান ঘোষণা করা হয় এবং আব্বাস আল-মুসাভীকে করা হয় তার নায়েব বা সহকারী। দক্ষিণ লেবাননে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইহুদীদের আক্রমণ এবং শিয়াদের অবস্থান

১৯৮২ সালে বিশেষত, জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখে লেবাননে যা ঘটে সেজন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। সেদিন সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ইহুদী হামলার শিকার হয়। এমনকি রাজধানী বৈরুত পর্যন্ত গিয়ে তারা অবরোধ আরম্ভ করে। তাদের এ অরাজকতার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াসির আরাফাত ও

১. বিলায়াতুল ফাকীহ (ولاية الفقيه) : বর্তমান ইসনা আশারিয়া শিয়াদের একটি বিশেষ আকীদা বা চিন্তাধারা। এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেই সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। –অনুবাদক

ফাতাহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং ফিলিস্তিনী সামরিক বাহিনীকে দক্ষিণ লেবানন থেকে বের করে দেওয়া।

লেবানন সমাজে ফিলিস্তিনীরা যেহেতু একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যা ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের কাছে ভালো লাগেনি—তাই ইহুদীদের এই উৎখাত অভিযানের প্রতি তাদের পূর্ণ সম্মতি ছিল। এ সময় ফিলিস্তিনীরা দফায় দফায় ইহুদীদের দ্বারা গণহত্যার শিকার হয়। তার মধ্যে 'সাবিরা ও শাতিলা গণহত্যা'[১] ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। এতে প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে ম্যারোনাইট খ্রিষ্টানদের সম্মতি ও অংশগ্রহণে ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদেরকে দক্ষিণ লেবানন ও বৈরুত থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়।

এই উৎখাত অভিযানে শিয়াদেরও মৌন সম্মতি ছিল। কেননা এই অঞ্চলে শিয়া রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তুতিস্বরূপ ফিলিস্তিনীদের সরিয়ে দেওয়ার চিন্তা তারা করছিল দীর্ঘদিন ধরে। তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে তৃতীয় পক্ষ তথা ইহুদীদের অভিযানে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় তখন, যখন ফিলিস্তিনীদের বের করে দিয়ে ইহুদীরা ফিরে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যায়। এমনকি লেবাননের বুকে তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে এবং একপর্যায়ে সমগ্র দক্ষিণ লেবাননে সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ইহুদীদের এ 'উপস্থিতি' হয়ে যায় শিয়াদের 'আশার গুড়ে বালি'। কারণ, ইহুদীদের বর্তমানে শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তা ছাড়া শিয়াদের আরও একটি জটিল সমস্যা ছিল—ধার্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দলে নিজেদের বিভক্তি।

পরিস্থিতির বিবেচনায় ধার্মিক দলটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক. হারকাতু আমাল থেকে বেরিয়ে আসা। দুই. ইরানী নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সমর্থন লাভ করা। এ লক্ষ্যে তারা তেহরান সফরের উদ্দেশ্যে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে; যারা ইরানে গিয়ে খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং 'বিলায়াতুল ফাকীহ' এর ওপর

---

১. مذبحة صابرا (أو صبرا) و شاتيلا ; Sabra and Shatila massacre. –অনুবাদক

নিজেদের বিশ্বাসের কথা বলে। আর এই সুবাদে খোমেনী ইরানের মতো লেবাননের শিয়াদের সর্বোচ্চ জিম্মাদার হয়ে যান।

জনাব খোমেনীর সম্মতি ও সমর্থন নিয়ে উল্লিখিত কাফেলা লেবানন ফিরে আসে। এসেই তারা হারকাতু আমালের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আব্বাস আল-মুসাভীর নেতৃত্বে নতুন দল তথা, 'হারকাতু আমালিল ইসলামিয়া'[১] বা 'ইসলামী আশার আন্দোলন' গঠন করে।

নতুন এ দলটির সহযোগিতায় ইরান অনেকটা এগিয়ে আসে। উদাহরণত, 'ইরানী বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী'-র[২] পনেরোশ সদস্য লেবানন পাঠানো হয়; যারা প্রথমে সিরিয়ায় এবং পরে সেখান থেকে লেবাননের বিকায় গমন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল হারকাতু আমালিল ইসলামিয়াকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সাধ্যমতো আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করা। এভাবে নতুন অস্তিত্বে আসা একটি সংগঠন ইরান ও সিরিয়ার মতো বৃহৎ দুটি রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। যদিও সিরিয়া তখনও 'হারকাতু আমালিল কওমিয়া'[৩] বা 'জাতীয় আশার আন্দোলন' এর দিকেও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল।

হিযবুল্লাহর প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিশৃঙ্খলা

একদিকে লেবাননে গৃহযুদ্ধের অগ্নি দিন-কে-দিন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে; অপরদিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে হারকাতু আমালিল ইসলামিয়ার শক্তি ও সক্ষমতা। একপর্যায়ে দলটির প্রধান দায়িত্বশীল আব্বাস আল-মুসাভী ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'হারকাতু আমালিল ইসলামিয়া'-র পরিবর্তে 'হিযবুল্লাহ' নামে একটি নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেন। এর তিন মাস পর ১৯৮৫ সালের মে মাসে নাবীহ বারির নেতৃত্বাধীন হারকাতু আমাল ফিলিস্তিনীদের ওপর এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড

---

১. Islamic Hope Movement (حركة أمل الإسلامية)

২. Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] (الحرس الثوري الإيراني)

৩. 'হারকাতু আমালিল ক্বওমিয়া' (حركة أمل القومية) দ্বারা সম্ভবত 'হারকাতু আমালিল ইসলামিয়া' গঠিত হওয়ার পর 'হরকাতু আমাল'-এর বাকি অংশকে বোঝানো হয়েছে, যা ছিল নাবীহ বারির নেতৃত্বাধীন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। –অনুবাদক

চালায়। যাতে শত শত ফিলিস্তিনী প্রাণ হারায়। এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ লেবানন থেকে ফিলিস্তিনীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

শিয়া অধ্যুষিত দক্ষিণ লেবানন ও বিকা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হারকাতু আমাল ও হিযবুল্লাহর মাঝে মারাত্মক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এই দ্বন্দ্ব একসময় সংঘাতে রূপ নেয়। পরিশেষে ১৯৮৮ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হিযবুল্লাহ বিজয় লাভ করলে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হারকাতু আমালের শতকরা ৯০ জন সদস্য হিযবুল্লাহয় যোগদান করে। আর হিযবুল্লাহ ছিল ইরানের প্রতি অনুগত, সিরিয়ার মদদপুষ্ট। এসব কারণে হারকাতু আমাল যাবতীয় সামরিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিছক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এতে হিযবুল্লাহর পথের কাঁটা অনেকটাই পরিষ্কার যায়। কিন্তু ঝামেলা একটা রয়ে যায় ইহুদীদের জন্য। কেননা ইহুদীরা শিয়াদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ লেবানন দখল করে আছে। এ কারণে তারা বৈরুতের কিছু এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে সেখান থেকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা সহজ হয়।

বৈরুতের পূর্বাঞ্চল খ্রিষ্টান অধ্যুষিত হওয়ায় সেদিকে না গিয়ে, হিযবুল্লাহ রওনা করে পশ্চিম দিকে, বিশেষত দক্ষিণ দিকে। এরপর অস্ত্রের জোরে একটু একটু করে সেসব এলাকা দখল করতে থাকে। দখলকৃত অঞ্চলগুলো যে ছিল সুন্নী অধ্যুষিত, সে কথা তো বলাই বাহুল্য। সেখানে তারা সাধারণ জমির পাশাপাশি সুন্নীদের মালিকানাধীন জমিতেও স্থাপনা নির্মাণ শুরু করে। এ ব্যাপারে লেবানন সরকার ছিল একেবারেই নিশ্চুপ।

এভাবে ধীরে ধীরে বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চল শিয়াদের দখলে চলে যায় এবং সেখানে হিযবুল্লাহর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮৯ সালে জনাব খোমেনী মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন ইরানী বিপ্লবের পথপ্রদর্শক আলী খামেনেয়ী। নেতার পরিবর্তন ঘটলেও

হিযবুল্লাহর আনুগত্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ, হিযবুল্লাহর কাছে আলী খামেনেয়ীও সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে গৃহীত হন।

১৯৮৯ সালেই সৌদি সরকারের উদ্যোগে লেবাননে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত দলগুলো তায়েফে সমবেত হয় এবং সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘাটে। একই বছর লেবাননী সুন্নীদের বিশিষ্ট মুরুব্বি শায়খ হাসান খালিদ রহিমাহুল্লাহকে হত্যা করা হয়। যিনি ১৯৬৬ সাল থেকে লেবাননের প্রধান মুফতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সুন্নীরা অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। অপরদিকে লেবাননের ভূমিতে 'ইসলামী' দল হিসেবে হিযবুল্লাহর নাম উঠে আসতে থাকে।

ইহুদীদের দমন এবং সুন্নীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা

যেসব এলাকা নিয়ে শিয়ারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিল সেগুলো ছিল ইহুদীদের দখলে। তাই তারা সেসব এলাকা স্বাধীন করার লক্ষ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সিরিয়ার প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ইরান থেকে আসে অঢেল সম্পদ। এসব দেখে ইহুদীরা বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৯২ সালে হিযবুল্লাহর মহাসচিব আব্বাস আল-মুসাভীকে হত্যা করে ফেলে। এরপর হিযবুল্লাহর মহাসচিব পদে আসীন হন জনাব হাসান নাসরুল্লাহ।

একই বছর সুন্নীরা নতুন নেতৃত্বের সন্ধান পেয়ে তার চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করে। নতুন এই নেতার নাম রফিক আল-হারীরী। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সব সময় তিনি লেবাননকে দু-হাতে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। তার প্রতি লেবাননের অসংখ্য মানুষ আস্থা রাখছে অনায়াসে।

১৯৯৬ সালে ইহুদীরা লেবাননে 'ক্রোধের আঙুর অভিযান'[১] নামে এক পাশবিক হত্যাযজ্ঞ চালায়। যার ফলে লেবাননীদের হৃদয়ে

১. Operation Grapes of Wrath (عملية عناقيد الغضب)

ইহুদীদের দখলদারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। এজন্য ইহুদীদের প্রতিরোধকল্পে হিযবুল্লাহ 'লেবাননী প্রতিরক্ষা ব্রিগেড'[১] গঠনের ঘোষণা দেয়। এই বাহিনীতে দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ যোগদান করে। তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্নীদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি তথা, ৩৮ শতাংশ। এ ছাড়া শিয়া ছিল ২৫ শতাংশ, দ্রুজ ২০ শতাংশ এবং খ্রিষ্টান ১৭ শতাংশ।

২০০০ সালে সম্মিলিত হামলার ফলে ইহুদীরা 'মাযারিউ শিবা'[২] বা 'শিবা খামার' নামক অঞ্চল বাদে দক্ষিণ লেবাননের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে হিযবুল্লাহ এই এলাকাগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এমনকি লেবাননী সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপও তারা প্রত্যাখ্যান করে।

লেবাননের এই স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, হিযবুল্লাহ অকৃতজ্ঞের মতো সকলের অবদান অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণাঞ্চল ও মাউন্ট লেবাননে সুন্নীদের মালিকানাধীন সম্পদও জবরদখল করে। ব্যক্তিগত সম্পদের পাশাপাশি মসজিদের ওপরও পড়ে তাদের কালো থাবা। বিশেষত 'আল-জিয়্যা' এলাকায় 'মাসজিদুন নাবী ইফনুস' এর নামে ওয়াকফকৃত সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

রফিক আল-হারীরীর দাবি এবং শিয়াদের তোড়জোড়

ইহুদীরা লেবানন ছেড়ে যাওয়ার বছরই রফিক আল-হারীরী নতুন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি তার অধীনস্থদের নিয়ে সর্বজনবিদিত সুন্নী প্রতিনিধি হিসেবে নতুনভাবে এমন এক আদর্শিক অবস্থানে উন্নীত হন, যা বাস্তবিকভাবেই লেবাননী শিয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গৃহীত হয়।

এদিকে হিযবুল্লাহর শক্তি দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল; আর তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, কীভাবে ইরান-সিরিয়া সমর্থিত কাঙ্ক্ষিত সেই

---

১. Lebaneese Resistance Brigades

২. Shebaa Farms (مزارع شبعا)

শিয়া রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। কিন্তু রফিক আল-হারীরী ও তারা যাবতীয় প্রয়াসের কারণে বিষয়গুলো লেবাননী জনসাধারণের কাছে সমতুল মনে হতে থাকে।

২০০৪ সালের কথা। লেবাননে তখন বিপুলসংখ্যক সিরীয় সৈন্যের অবস্থান। হঠাৎ রফিক আল-হারীরী এই সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার দাবি তোলেন। দাবি উপেক্ষিত হলে তিনি পদত্যাগ করে বসেন। এরপর ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আকস্মিকভাবে বৈরুতে নিজ গাড়িতে রফিক আল-হারীরী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

লেবাননে তখন অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থার লোক কাজ করছিল। তার মধ্যে মার্কিন, ফরাসী, সিরীয়, ইরানী, ইরাকী সংস্থার কথা উল্লেখযোগ্য। এদের সকলের টার্গেট ছিল সুন্নীদেরকে রফিক আল-হারীরীর মতো একজন সুযোগ্য ও মহান নেতার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ঘারীরী হত্যাকাণ্ডের পর লেবাননের পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের আঙুল উত্থিত হয় সিরিয়ার দিকে। এজন্য সিরিয়াকে লেবানন থেকে সরে আসার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও চাপ প্রয়োগ করা হয়। হিযবুল্লাহ তখন এ সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এমনকি লেবাননে সিরীয় সেনাদের অবস্থানের পক্ষে তারা ২০০৫ সালের ৮ই মার্চ এক বিরাট লংমার্চের আয়োজন করে।

তাদের প্রতিরোধকল্পে গড়ে ওঠে 'তাইয়্যারুল মুসতাকবাল' বা 'ভবিষ্যৎ আন্দোলন'[১]। এটি ছিল সাদ আল-হারীরী নেতৃত্বাধীন হারীরী পরিবারের আন্দোলন। উপরন্তু দ্রুজ নেতা ওয়ালীদ জুমবলাত নেতৃত্বাধীন 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট'[২] এবং ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান নেতা সামির জায়জায় নেতৃত্বাধীন 'লেবানন বাহিনী'-র[৩] সমর্থন লাভ করে। এরপর ২০০৫ সালের ১৪ই মার্চ সিরীয় সেনাদের বিতাড়নের দাবি নিয়ে এক বিরাট

---

১. Future Movement (تيار المستقبل)

২. كتلة اللقاء الديمقراطي

৩. Lebanese Forces (القوات اللبنانية)

বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মার্চের ১৪ তারিখে হওয়ায় বিশাল এই জনসমাগমকে '১৪ই মার্চ' নামে অভিহিত করা হয়। এ বিক্ষোভের তোপে চলতি মাসেই সিরীয় সেনাবাহিনী লেবানন ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

হিযবুল্লাহর সঙ্কট এবং ২০০৬ সালের যুদ্ধ

সিরীয় সেনারা লেবানন ছেড়ে গেলে হিযবুল্লাহ বহুমুখী সঙ্কটের সম্মুখীন হয়; বিশেষত হারীরীর মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক কলহ বৃদ্ধি পেলে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। তাই এ পর্যায়ে তারা বিভিন্ন শক্তিশালী দলের সাথে মিলে রাজনৈতিক কার্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ২০০5 সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এ লক্ষ্যে তারা তিনটি দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। সেগুলো হলো সুন্নীদের তাইয়ারুল মুসতাকবাল, দ্রুজদের তাইয়ারু জুমবালাত এবং হারকাতু আমাল। এদের মাঝে প্রথম দুটি দলের সাথে শক্রতার বিষয়টি তো সকলেরই জানা। অতঃপর তাদের এ জোট 'চারদলীয় ঐক্যজোট' নামে লোকমুখে প্রসিদ্ধি পেতে থাকে। চারদলীয় এই জোটের প্রার্থীরা জাতীয় নির্বাচনে ১২৮টি আসনের ৭২টিতে জয়ী হওয়ার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ফুয়াদ সিনিওরার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

মতের চরম অমিল থাকা সত্ত্বেও একরকম নিরুপায় হয়েই হিযবুল্লাহ সুন্নীদের নৌকায় পা রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিজেদেরকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে পেশ করা। কিন্তু এরপরও হাসান নাসরুল্লাহ সাধারণত কোনো সভা-সমাবেশে উপস্থিত না হয়ে কেবলই প্রতিনিধি পাঠাতেন। ভাবটা ছিল এমন, যেন তিনি অন্যান্য নেতাদের সমকক্ষের কেউ নন, বা তিনি তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

তার এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ সম্ভবত ছিল ২০০৬ সালের ১২ জানুয়ারি ইহুদীদের ওপর সামরিক অভিযান চালিয়ে দুজনকে বন্দি ও আটজনকে হত্যা করতে পারা। এই অভিযানে হিযবুল্লাহ রাষ্ট্রের কারও কাছে কোনো রকম সাহায্য কামনা করেনি, না

প্রত্যক্ষভাবে, না পরোক্ষভাবে। আর যাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাদের কাছেও যেতে হয়নি কোনো প্রয়োজন নিয়ে। যদিও বাস্তবতা হলো এই অভিযানে একসময় সম্পূর্ণ রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে কেবল হিযবুল্লাহই নয়, অন্যরাও লড়ে।

প্রসিদ্ধ এ যুদ্ধটি ঘটে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। টানা ৩৩ দিন পর্যন্ত ইহুদীরা লেবাননে বোমাবর্ষণ করতে থাকে। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রথমে হিযবুল্লাহ এবং পরে লেবাননের সম্পূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া। জবাবে হিযবুল্লাহও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে শুরু করে। লেবাননের ভূখণ্ডে অসংখ্য মানুষের লাশ পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা হিযবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। এটিকে হিযবুল্লাহর জন্য অনেক বড়ো অর্জন হিসেবে দেখা হয়। কেননা, হিযবুল্লাহর হামলা বন্ধের পূর্বেই ইহুদীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল; বন্দি সৈন্যদের মুক্ত করতেও ছিল অক্ষম।

যুদ্ধ শেষ হলো; ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গেল, লেবাননী জাতিকে স্বদেশের ছিন্নভিন্ন রূপ দেখতে হলো। দেখতে হলো, হিযবুল্লাহরূপী শিয়াদের উত্থান, যারা তখন উন্নত ইরানী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল এবং যাদের পক্ষে ছিল সিরিয়ার সর্বাত্মক সমর্থন। এসব দেখে খুব সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল লেবাননের ভবিষ্যৎ-নেতৃত্ব শিয়াদের হাতেই। বিশেষত, হিযবুল্লাহকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়তে ও জয়ী হতে দেখে মুসলিম উম্মাহর আবেগী সমর্থন তখন ছিল তাদের পক্ষেই।

এবার প্রশ্ন জাগতে পারে, এরপর লেবাননে কী ঘটল? শিয়াদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী ছিল? লেবাননের ভবিষ্যৎ নিয়ে হাসান নাসরুল্লাহ তার স্বপ্নগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন? হিযবুল্লাহর এমন উত্থান সত্ত্বেও কেন তারা ২০০৯ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে হেরেছিল? এ প্রসঙ্গে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কেমন হওয়া উচিত?

হিযবুল্লাহ-সমাচার : তিন

'হিযবুল্লাহ-সমাচার : এক' এবং 'হিযবুল্লাহ-সমাচার : দুই' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এই দলটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি সিরিয়া ও ইরানের সঙ্গে তাদের অবকাঠামোগত সম্পর্ক এবং লেবাননে স্বতন্ত্র শিয়া রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে। সর্বশেষ তুলে ধরেছি ২০০৬ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য।

উল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখেছি, এই যুদ্ধে ইহুদীরা হিযবুল্লাহর ক্ষতি করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে; হিযবুল্লাহর নেতাদের নিয়ে করা তাদের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এসব দেখে মুসলিম উম্মাহ বেশ আনন্দিত হয়েছে; বিশেষত তরুণ প্রজন্ম হয়েছে অভিভূত; তাদের উচ্ছ্বাস সত্যিই চোখে পড়ার মতো। এর পেছনে অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে। কেননা, ১৯৭৩ সালের পর থেকে প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত তারা কোনো যুদ্ধে ইহুদীদেরকে পরাজিত হতে দেখেনি।

সব মিলিয়ে লোকমুখে হিযবুল্লাহর, বিশেষত এর মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহর প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়। কেউ কেউ তো তাকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত নেতা মনে করতে থাকে; তার 'ব্যাকগ্রাউন্ড' যে ইসনা আশারিয়া শিয়া, তা বেমালুম ভুলে যায়; ভুলে যায়, তিনি সেই মতাদর্শের অনুসারী, যাতে সর্বাবস্থায় সুন্নীদেরকে ঘৃণা করতে বলা হয়, প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে।

হাসান নাসরুল্লাহ এবং সরকার বিরোধিতা

২০০৬ সালে ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিযবুল্লাহর বিজয় বেশ বড়োসড়ো ব্যাপার ছিল। এতে তাদের মনোবল অনেকখানি বৃদ্ধি পায় এবং তারা এটাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে চায়। এই ভাবনা থেকে নিজেদের শরিক সরকারের বিরুদ্ধেই তারা অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারা এক বিশাল প্রস্তুতি নিয়ে সরকারি সদর দফতরের সামনে অবস্থান গ্রহণ শুরু করে। দীর্ঘদিন এ আন্দোলন টিকিয়ে রাখতে তারা সেখানে ছয় শতাধিক তাঁবু স্থাপন করে। তাদের দাবি ছিল 'সুন্নী' রাষ্ট্রপতি ফুয়াদ সিনিওরার পদত্যাগ। যদিও লেবাননের সংবিধান অনুযায়ী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে সুন্নীদেই একজন।

হিযবুল্লাহ লেবাননে যাচ্ছেতাই করতে পারে, দাবি আদায়ের মাধ্যমে তারা মূলত এটাই দেখাতে চাচ্ছিল। তবে তার স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন তাকে অবশ্যই লেবাননের প্রত্যাশিত নেতৃত্ব এবং হাসান নাসরুল্লাহর আদর্শের অনুগামী হতে হবে। কিন্তু সরকার হাসান নাসরুল্লাহর এই খামখেয়ালিপনা মেনে নেয়নি। ফলে লাগাতার প্রায় আঠারো মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে।

এরপর হিযবুল্লাহ সামরিক আন্দোলন শুরু করলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ আকার ধারণ করে। বৈরুতের পশ্চিম প্রান্তজুড়ে ছিল সুন্নীদের বসবাস। হিযবুল্লাহ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই এলাকাটি অবরোধ করে বসে এবং হুমকি দিতে থাকে সরকার তাদের দাবি না মেনে নিলে হয়তো সদর দপ্তরের সামনের অবরোধ অব্যাহত থাকবে, আর নয়তো সুন্নীদের ওপর হামলা করা হবে। সময়টি ছিল ২০০৮ সালের ৯ই মে।

বিষয়টি কেবল দুশ্চিন্তারই ছিল না, ছিল মারাত্মক ভয়েরও। কেননা তখন রাজধানী বৈরুতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হামলা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা রীতিমতো মহড়া চালাচ্ছিল।

এদিকে ওয়ালীদ জুমবলাত এই ঘটনা ঘটার ৬ দিন আগে, অর্থাৎ ২০০৮ সালের ৩ মে এমন কিছু ঘটার ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেদিন তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে লেবাননের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

ইলিয়াস মুর এবং লেবাননী সেনা-গোয়েন্দাদের মাঝে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এসব চিঠি থেকে জানা গেছে, হিযবুল্লাহ কর্তৃক স্থাপিত অনেকগুলো ক্যামেরা দ্বারা লেবানন বিমানবন্দর বেষ্টিত।

ওয়ালীদ জুমবলাত এই সংবাদ সম্মেলনে আরও জানান, যে সময়ে লেবাননের অভ্যন্তরে বিদেশি অস্ত্র প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইরান থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র হিযবুল্লাহর হস্তগত হয়েছে। আর সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন সমগ্র লেবাননে সশস্ত্র বাহিনী বলতে কেবল হিযবুল্লাহই টিকে থাকবে; কিংবা লেবাননের সরকারি সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে।

দোহা চুক্তি এবং নাসরুল্লাহর পতন

লেবাননের রাজধানী বৈরুত ঘিরে সেই অবরোধ ১৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর কাতারের রাজধানী দোহায় একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা তুলে নেওয়া হয়; সঙ্গে তুলে নেওয়া হয় সরকারি সদর দপ্তরের সামনে চলা অবস্থান ধর্মঘটও। কিন্তু এর সঙ্গে ভেঙে যায় তাদের সেই চারদলীয়[১] ঐক্যজোট। দলগুলো বুঝতে পেরেছিল যে, এ ধরনের জোট পরিশেষে আসল লক্ষ্য পূরণেই জটিলতা তৈরি করে। বিশেষত সুন্নী ও শিয়াদের গন্তব্য কোনোভাবেই এক হতে পারে না।

জোট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে উভয় দল একে-অপরের প্রতি বিভিন্ন রকম অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। একদিকে তাইয়ারুল মুসতাকবাল বা ১৪ই মার্চের সমাবেশে যোগদানকারীরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, শিয়ারা সমগ্র লেবানন একটু একটু করে গ্রাস করে নেবে। অপরদিকে হিযবুল্লাহর অভিযোগ আমেরিকার সঙ্গে তাইয়ারুল মুসতাকবালের গোপন সম্পর্ক রয়েছে। এ অভিযোগের একমাত্র কারণ

১. সুন্নিদের তাইয়ারুল মুসতাকবাল, শিয়াদের হিযবুল্লাহ ও হারাকাতু আমাল এবং দ্রুজদের কুতলাতু লিকা আল-দিমুকরাতী।

ছিল লেবাননী জাতির কাছে তাইয়ারুল মুসতাকবালকে ছোটো করা এবং জাতীয় আন্দোলনে তাদের অবদানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা।

অভিযোগ ও অনুযোগ সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে ২০০৯ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত। নির্বাচনে সাদ আল-হারীরীর নেতৃত্বাধীন '১৪ই মার্চ আন্দোলনে'-র বিরুদ্ধে হাসান নাসরুল্লাহর নেতৃত্বাধীন হিযবুল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক দলই তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রচার করতে থাকে। এ সময়ও একের বিরুদ্ধে অপরের অভিযোগ-অপবাদ ছিল অব্যাহত।

মজার ব্যাপরা হলো, এই নির্বাচনে হাসান নাসরুল্লাহর ভরাডুবি হয়; যা তার মতো একজন বিদগ্ধ রাজনীতিকের বেলায় ছিল নিতান্তই অকল্পনীয়। আসলে 'ব্যালটবক্সে' তার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই ছিল।

২০০৯ সালের ২৯ মে। নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। এ দিন জনাব নাসরুল্লাহ জাতির উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণটি হিযবুল্লাহর ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত আছে। তিনি তাতে বলেন, হিযবুল্লাহ নির্বাচনে বিজয়ী হলে সিরিয়া ও ইরান থেকে লেবাননে প্রচুর অস্ত্র আনা হবে। তার এমন খোলামেলা কথাবার্তায় শিয়াদের আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। সেদিন তিনি একবাক্যে বলে দিয়েছিলেন, ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিশেষত, জনাব খামেনেয়ী লেবাননকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন।[১]

লেবাননীদের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, তাদের জান-মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষার্থে যত অর্থ প্রয়োজন, সব শিয়াদের তরফ থেকে খরচ করা হবে। তার এই আশ্বাস লেবাননীদের মনে একই সঙ্গে আশা ও আশঙ্কার জন্ম দেয়; বহির্বিশ্বের সঙ্গে হিযবুল্লাহর সম্পর্ক এবং তাদের সক্ষমতার পরিধি নিয়ে ভাবায়।

---

১. বিস্তারিত দেখুন হিযবুল্লাহর ওয়েবসাইট—www.moqawama.com-এ।

হাসান নাসরুল্লাহর বার্তা লেবানন জাতির কাছে পৌঁছে যায়; যদিও তারা তার কামনার ঠিক উল্টোটি বুঝে নেয়। তাদের সামনে শিয়াদের বিভৎস রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, হিযবুল্লাহর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার মানে, হিযবুল্লাহর শক্তিই বৃদ্ধি করা, লেবাননের নয়। এবং সিরিয়া-ইরান-অনুগত শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও খুব বেশি দূরে নয়।

এসব ভাবনা থেকে লেবানন জাতি যথেষ্ট ভয় পেয়ে যায়। যার প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনী ব্যালটবক্সে। নির্বাচনের দিন লেবাননীরা দলমত নির্বিশেষে '১৪ই মার্চ আন্দোলনে' ভোট দেয়। যদিও সাদ আল-হারীরী রফিক আল-হারীরীর সমপর্যায়ের নেতা ছিলেন না, কিন্তু অমন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে তাদের হাতে আর কোনো বিকল্পও ছিল না।

বলার অবকাশ রাখে না, এমন একটি ফলাফল প্রকাশের পেছনে মার্কিন চাপও ছিল যথেষ্ট। নির্বাচন হয়েছিল খুবই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। কেউ এর স্বচ্ছতা নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেনি। এতে ১৪ই মার্চ আন্দোলন ১৪ আসনের ব্যবধানে জয়লাভ করে। লেবাননের নির্বাচনে এটি চাট্টিখানি কথা নয়। আর এর মাধ্যমে সবকিছু স্পষ্টভাবে ও বড়ো পরিসরে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

হিযবুল্লাহ নিয়ে আমাদের ভাবনা

এই দীর্ঘ আলোচনার পর এবার আমি একজন পাঠক হিসেবে কয়েকটি বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাই। আশা করি তাতে মুসলিম ভাইদের মনে জাগা অনেক প্রশ্নের উত্তর থাকবে। আর এতে হয়তো অনেকে আমাকে বাহবা দেবে, আবার অনেকে বিরোধিতাও করবে; কিন্তু সকলের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে চাইলে আমাদের উচিত নিজেরদের আবেগানুভূতি একপাশে রাখা এবং বিবেক-বিবেচনা থেকেই কথা বলা। প্রতিটা বিষয় খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা, একদম গোড়ার খবর নেওয়া; ইতিহাস, ঐতিহ্য, অতীত, বর্তমান—কোনোকিছু যেন জানাশোনা থেকে বাদ না পড়ে, সেই খেয়াল রাখা। আলোচ্য দল বা সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পটভূমি, আকীদা,

বিশ্বাস, বিভক্তি—সবকিছু নখদর্পনে রাখা। এভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব হলে অনেক সময়ই দেখা যায় সঠিক জেনে আসা বিষয় নিয়ে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে; এতদিন যাদের পক্ষে আমরা ছিলাম, এখন তারাই আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, কিংবা এতদিন যাদের বিরোধিতা আমরা করে এসেছি, এখন তাদেরই পক্ষ নিতে হচ্ছে।

প্রথমত : লেবাননে শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

লেবাননের ভূখণ্ডে একটি আলাদা শিয়া রাষ্ট্র গড়ে উঠার প্রবল সম্ভাবনা এখনো রয়েছে। এমনকি অদূর ভবিষ্যতে তেমনটি ঘটে যেতেও পারে। আর এটি মোটেও হিযবুল্লাহর মতো একটি একক দল বা গোষ্ঠীর ব্যাপার নয়, বরং পুরোদস্তুর রাষ্ট্রের বিষয়। কেননা, সিরিয়া ও ইরান খুব করে চাচ্ছিল যেন লেবাননে তাদের অনুগত একটি শিয়া রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এজন্য তাদের সমর্থন ও সহায়তা ছিল অব্যাহত, যা মোটেও ছোটখাটো ব্যাপার নয়। তাদের পরিকল্পনা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলকে কেন্দ্র করে, পূর্ব-দক্ষিণের বিকা অঞ্চল নিয়ে এ রাষ্ট্রটি গঠিত হবে এবং উত্তর লেবাননের সুন্নী অঞ্চল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটবে।

একইভাবে তারা পশ্চিম ও দক্ষিণ বৈরুতও দখল করে নেবে। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে যদিও কিছুটা দ্বিমত থাকতে পারে। তবে এমনটা মোটেও অসম্ভব নয় লেবাননের ভূমিতে খ্রিষ্টান ও শিয়াদের স্বতন্ত্র দুটি রাষ্ট্র কায়েম হলে হিযবুল্লাহ তা স্বাচ্ছ্যন্দেই গ্রহণ করবে। কেননা, আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সুন্নী অধ্যুষিত শামে[১] ক্রুসেডারদের আগমন ঘটলে কীভাবে এই ভূমি ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়া যায়, ক্রুসেডারদের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেছিল ইসমাঈলিয়া শিয়া সম্প্রদায়।

কথা ছিল ক্রুসেডাররা দখল করবে বর্তমান সিরিয়া ও লেবানন, আর শিয়ারা নেবে ফিলিস্তিন ও জর্ডান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডাররা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র শাম দখল করতে চায়।

---

১. 'শাম' বলতে সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্ডান নিয়ে গঠিত ঐতিহাসিক 'বিলদুশ শাম' উদ্দেশ্য। –অনুবাদক

লেবাননে শিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সুন্নীদের বিবেচনায় মোটেও সহজ ও সুন্দর কিছু নয়। কেন নয় তা জানতে চাইলে নজর বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে ইরান-ইরাকের সুন্নীদের দিকে, সুন্নীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রথমে হারকাতু আমাল এবং পরে হিযবুল্লাহর ঘটনাপ্রবাহের দিকে। পাশাপাশি শিয়াদের বুওয়াইহিয়া, উবাইদিয়া, হামদানী, সাফাভিদ ইত্যাদি সাম্রাজ্যের আচরণ সুন্নীদের সঙ্গে কেমন ছিল, সেই ইতিহাসও জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এসব ইতিহাস পাঠ করলে আপনা-আপনিই জেনে যাবেন শক্তিশালী প্রতিটি শিয়া সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন চালিয়েছে সুন্নীদের বিরুদ্ধে। আর আকীদাগত বিরোধ ছিল সর্বাগ্রে—শুরু থেকে শেষ সম্পূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ কেবল তা-ই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত : স্বার্থের সংঘাত

হিযবুল্লাহ ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে কেবল নিজেদের স্বার্থে; বিশ্বাস বা চেতনাগত কোনো বিরোধ থেকে নয়। ইহুদীরা ১৯৮২ সালে দক্ষিণ লেবানন দখল করে। আর এই দক্ষিণ লেবানন ছিল কাঙ্ক্ষিত শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্ধারিত স্থান। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধের কোনো বিকল্প তাদের হাতে ছিল না। পৃথিবীর দেশে দেশে যে যুদ্ধগুলো হয়ে থাকে, এটি ছিল তেমনই একটি।

মোটকথা, কোনোভাবেই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা ছিল না। কেননা শিয়ারা যে কালিমায় বিশ্বাসী, নিঃসন্দেহে তা ভ্রান্ত ও বিকৃত। তারা তাদের ইমামদেরকে নিষ্পাপ মনে করে, তাদেরকে নবীদের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান করে! এমন আকীদা যারা রাখে, তাদের মাঝে ভালো কিছু আর কীভাবে থাকতে পারে!?

ধরে নেওয়া যাক শিয়াদের অবস্থান লেবাননের পূর্বাঞ্চলে আর সুন্নীদের আবাস দক্ষিণাঞ্চলে; এবং এ অবস্থায় ইহুদীদের আগ্রাসন ঘটল। আপনার কি মনে হয়, সুন্নী অধ্যুষিত সে অঞ্চল উদ্ধার করতে শিয়ারা এগিয়ে আসবে? কস্মিনকালেও কিন্তু তা সম্ভব না। বরং যথেষ্ট সম্ভাবনা

রয়েছে যে, তারা ঠান্ডা মাথায় লেবাননের ভূমি ইহুদীদের সাথে ভাগাভাগি করে নেবে।

আমার এ ধারণা ভিত্তিহীন কিংবা অমূলক নয়। কারণ, লেবাননে শিয়াদের অবস্থান কয়েক দশক ধরে। এরই মধ্যে কি তারা ফিলিস্তিনে থাকা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা কখনো ভেবেছে? নিশ্চয় না। অথচ বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তো ঠিকই চোখের পানি ছেড়ে বলে, 'ফিলিস্তিন দখলদার ইহুদীদের আগ্রাসনের শিকার'।

১৯৪৮ সালে যুদ্ধ চলাকালে, মুসলিম ব্রাদারহুডের সিরিয়া শাখার তত্ত্বাবধায়ক আল্লামা ডক্টর মুস্তফা আস-সিবাঈ শিয়া ও সুন্নীদের মাঝের দূরত্ব ঘুঁচিয়ে আনতে চেষ্টা করেন; শিয়া-সুন্নী মিলে ফিলিস্তিন স্বাধীন করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর এই মহতী উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করে শিয়ারা নিজেদের পথ ধরে। শেষ পর্যন্ত আল্লামা মুস্তফা আস-সিবাঈর সকল প্রচেষ্টা তাদের জন্য ব্যর্থ হয়। *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিল ইসলাম* নামক কিতাবে তিনি লিখেন, শিয়া-সুন্নী সমঝোতা বলতে গেলে অসম্ভব। কেননা, শিয়াদের মতে এর অর্থ হলো সুন্নীরা সব শিয়াতে রূপান্তরিত হওয়া; কেবল অভিন্ন ভূখণ্ডে মিলেমিশে বাস করা নয়।

উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ফিলিস্তিনের উত্তর সীমান্ত-ঘেঁষা শিয়াদেরকে এক চুলও নড়তে দেখা যায়নি। এমনকি ১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে মূসা আস-সদরকে তার প্রসিদ্ধ উক্তি—অস্ত্র পুরুষের সৌন্দর্য—আওড়াতে দেখা গেছে; কিন্তু এই বক্তব্যের মাত্র ছয় মাস পর, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ফিলিস্তিনে ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজন শিয়াও অস্ত্র ধারণ করেনি।

২০০৯ সালে গাজায় সংঘটিত সর্বশেষ যুদ্ধ তো আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছি। ইহুদী সন্ত্রাসীরা তখন ফিলিস্তিনে কী নৃশংস বোমাহামলাই না চালিয়েছে। হিযবুল্লাহর পক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এই হামলা প্রতিহত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমরা কেবল তাদের বড়ো

বড়ো কথাই শুনেছি, ইহুদীদের বিরুদ্ধে কখনো একটি ক্ষেপণাস্ত্রও নিক্ষেপ করতে দেখিনি।

এখান থেকে ইহুদীরা খুব ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছিল যে, হিযবুল্লাহর হাঁক-ডাক, লম্ফ-ঝম্প তাদের ত্রিসীমার ভেতরেই সীমাবদ্ধ। হাল-জমানায় ফিলিস্তিন নিয়ে তাদের তো নয়ই, ইরানেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরানের হুঙ্কার যেমন কোনো গুরুত্ব রাখে না, ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিযবুল্লাহর বুলিও তেমনই। এসব হুঙ্কার দিয়ে মুসলিম উম্মাহর সমর্থন পাওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

তা যদি না-ই হতো, তাহলে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইরাকে শিয়াদের মিশন বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল না। শুধু তা-ই নয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ বলে—ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন নিয়ে বৃহত্তর শিয়া রাষ্ট্র গঠিত হলেও আমেরিকা কিছুই বলবে না। কেননা, তখন বৃহত্তর এ রাষ্ট্রটি মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য হবে, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামী বিশ্বে বিশেষত, মিশর, সৌদি আরব এবং জর্ডানে সুন্নী মুসলিমদের সকল জাগরণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আর আমেরিকা নিজেও এ দেশগুলোর রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি খর্ব করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত : সফলতা শুদ্ধতার মাপকাঠি নয়

কারও সফলতা কিংবা সুপরিণতি কখনো তার শুদ্ধতা ও সঠিকতার মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা, অতীতে কত বিদআতীকে আমরা বিজয়ী হতে দেখেছি। কারমাতি শিয়াদেরকে আমরা দেখেছি তারা যুগের পর যুগ রাজত্ব করছে। অথচ এরাই কিন্তু আবার হাজিদের হত্যা করেছে, হাজরে আসওয়াদকে স্থানচ্যুত করেছে, বছরের পর বছর আল্লাহর জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে।

আমরা দেখেছি অসংখ্য ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও পারস্য, রোমান, তাতার, ইংরেজ ও মার্কিনীরা জয়লাভ করেছে, করছে। দেখেছি

অত্যাচারী, অহংকারী এবং ইসলামের বিধান অমান্যকারী মুসলিম শাসকের দম্ভ, যে বছরের পর বছর তার অধীনস্থদের প্রতি জুলুম করে গেছে।

মোটকথা, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সফলতা কিংবা বিফলতা কখনো তাদের কর্মপন্থার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সুনিশ্চিত তথ্য বহন করে না। বরং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার বা তাদের প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণ সামনে রেখে; দেখতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে তাদের কাজকর্ম, উঠাবসা কতটা সামঞ্জস্যতা রাখে।

আমরা জানি, এমন কত বীরও আছে, যারা যুদ্ধের ময়দানে বিরাট অবদান রেখেও হবে জাহান্নামি। কারণ তাদের বীরত্ব আল্লাহর ওয়াস্তে ছিল না।

হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক লোক মুশরিকদের একেবারে কচুকাটা করেছিল। এটা দেখে লোকেরা তাকে মহান মুসলিম মুজাহিদ মনে করতে লাগল। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহান্নামি হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকেরা দৌড়ে গিয়ে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেল। তখন সে তাদেরকে বলল, আমি তো কেবল আমার গোত্রের জন্যই যুদ্ধ করেছিলাম।[১]

হাদিসে উল্লেখিত ঘটনায় লোকটি যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধে যায়নি, সুতরাং তার লড়াই হবে স্বার্থের লড়াই; তার বিজয় ও সফলতার ভিত্তি হবে মিথ্যা ও বাতিল।

মনের কথা যেহেতু আল্লাহর ছাড়া আর কারও জানা নেই, তাই আমরা হিযবুল্লাহর নিয়তের ব্যাপারে আগে বেড়ে কিছু বলব না। তাই বলে আমরা তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও প্রকাশ্য বিদআত সম্পের্কও কিছু বলব না, তা কিন্তু নয়। 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার' শিরোনামের লেখাটি আরও একবার পাঠ করা যেতে পারে। আপনাদের নিশ্চয় মনে

---

১. *সিরাতু ইবনে হিশাম* (দারুল মা'রিফা, বৈরুত থেকে প্রকাশিত, শায়খ মুস্তফা কর্তৃক তাহকীককৃত।) খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫২৪, ৫২৫

আছে, সেখানে আমি দেখিয়েছি, বিভিন্ন যুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করেছে তো ঠিক, কিন্তু বরাবরই তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল ভ্রান্ত, সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত।

চতুর্থ : সুন্নীদের অবস্থান

হিযবুল্লাহর ও ইহুদীদের মধ্যকার যুদ্ধ যেহেতু স্বার্থের খেলা, তাই সুন্নীদের এক্ষেত্রে কোনো মতামত থাকতে পারে না, বিষয়টি আমার কাছে মোটেও এমন মনে হয় না। এ নিয়ে অবশ্য আমার অনেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের সঙ্গে আমার দ্বিমত দেখা দিয়েছে। কারণ, উভয় দল ভ্রান্ত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে তাঁরা নীরব থাকার পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমেরই তো একটি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিৎ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এবং সে সবকিছুর ভালো-মন্দ বিবেচনা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

এই যুদ্ধের একপক্ষ ইহুদী সম্প্রদায় যারা অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে আছে। আর অপরপক্ষ হিযবুল্লাহ; যাদের দেশে ইহুদীরা অনুপ্রবেশ করেছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে-কোনো মূল্যে ইহুদীদের শক্তি খর্ব হওয়াই এখানে কাম্য। কেননা, তাদের অন্যায়-আগ্রাসন দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। একইভাবে লেবানন থেকেও ইহুদীদের বিতাড়িত করা আবশ্যক। আরও আবশ্যক হলো, মুসলিম উম্মাহর নিজেদের হক সম্পর্কে সচেতন হওয়া; হিযবুল্লাহ কিংবা ইহুদীদের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে তা রক্ষা করা।

১৯৯৭ সালে লেবানন থেকে ইহুদীদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল, তাতে সুন্নীদের বিপুল অংশগ্রহণ আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে; যদিও এর নেতৃত্বে ছিল হিযবুল্লাহ এবং তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুন্নীদের সকল অবদান অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সবশেষে মুসলিম উম্মাহর একটি সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও অবস্থান কিন্তু আছে।

আমরা অনেকেই জানি, আবু জাহেল জনৈক মুশরিকের মাল আত্মসাৎ করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকের পক্ষ নেন। তখন কিন্তু নবীজি এ কথা বলেননি, মুশরিক তো তার মাল দেবতার জন্য উৎসর্গ করবে, তাই থাক—তার পক্ষ আমি নেব না। বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুশরিকের পক্ষ নিলেও পরবর্তী সময়ে তার ধর্মের বিপক্ষে গিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

সুতরাং এ বিষয়গুলো আমাদের কাছে মোটেও সংশয়পূর্ণ নয়। এই অঞ্চলে শিয়া মতাদর্শ বাস্তবায়নে হিযবুল্লাহর যাবতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমরা অনবগত নই। কিন্তু হাল-জমানায় ইহুদীদের প্রতিহত করার বিষয়টি বেশিই গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম : হাসান নাসরুল্লাহ

হাসান নাসরুল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার মাঝে এমন অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তিনি আশপাশের সকলকে অনায়াসে মুগ্ধ করতে পারেন, নেতৃত্ব দিতে পারেন সুবিশাল এক জামাআতকে। তিনি একাধারে বিদগ্ধ রাজনীতিক, তুখোড় মেধাবি এবং অনুপম প্রত্যুৎপন্নমতি।

তার সুনিপুণ রাজনীতি এবং চাতুর্যময় নেতৃত্ব দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবে; রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং অসাধারণ বাগ্মিতার প্রতিও মানুষ আকর্ষিত হবে খুব সহজে। মুসলিম উম্মাহর কাছে যদি তার এ সকল গুণ পছন্দনীয় হয়েও থাকে, তাতে দোষের কিছু দেখি না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তার অনুসরণও করা যেতে পারে। কিন্তু যে কাজটি করার কোনো অবকাশ নেই তা হলো, তাকে জাতির কর্ণধার ভেবে বসে থাকা, আল্লাহর মহান আদেশ জিহাদের মতো আমলে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য মনে করা।

তিনি কোনোভাবেই এই স্তরে উপনীত হতে পারেন না। কেননা, সেজন্য তাকে বিশুদ্ধ আমল ও আকীদার অধিকারী হতে হবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে, আল্লাহ আদেশ-নিষেধের সামনে হতে হবে বিনয়াবনত। আর এর কোনটিই তার মাঝে নেই।

হাসান নাসরুল্লাহর আকীদা-বিশ্বাস

আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, একজন হাসান নাসরুল্লাহ আপাদমস্তক ইসনা আশারিয়া শিয়া মতাদর্শের অনুসারী। তিনি মনে-প্রাণে এই মতবাদই লালন করেন। ফলে, তিনি বিশ্বাস করেন সাহাবীরা যোগ্যতা সত্ত্বেও হযরত আলীকে উপেক্ষা করে পর্যায়ক্রমে হযরত আবু বকর, উমর ও উসমানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; তিনি বিশ্বাস করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথিত বারো ইমামের নাম ধরে ওসিয়ত করে গেছেন; তাদের সকল ইমাম নিষ্পাপ, পূত-পবিত্র; তাদের সর্বকনিষ্ঠ ইমাম এখনো কোনো গুহায় আত্মগোপন করে আছেন যিনি একদিন-না-একদিন বেরিয়ে আসবেন; তিনি বিশ্বাস করেন তাকিয়া দীনের নয়-দশমাংশ—যার অর্থ : মুখে এক অন্তরে আরেক।

তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, সুন্নীরা আহলে বাইতের প্রতি ভীষণ শত্রুতা পোষণ করে; অথচ বাস্তবতা হলো, সুন্নীরা তাঁদের প্রতি শিয়াদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা লালন করে; যার সবটুকু আবেগ-বর্জিত এবং সুন্নাহ-সম্মত। তার মতে, নেতৃত্বস্থানীরা অধীনস্থদের উপার্জন থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করার অধিকার রাখে; কোনো পুরুষ চাইলে কিছু সময় কিংবা কিছুদিনের প্রয়োজনে কোনো নারীকে বিয়ে করতে পারবে, এবং প্রয়োজন শেষে ত্যাগও করতে পারবে, শরীয়তের পরিভাষায় যাকে বলে 'নিকাহে মুত'আ'। তিনি 'বিলায়াতুল ফাকীহ' চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তাই তার কাছে কোনো বিষয়ে ইরানী বিপ্লবের নেতা আলী খামেনেয়ীর বিরুদ্ধাচরণ মারাত্মক অপরাধ। তার এমন আরও অসংখ্য অসঙ্গত আকীদা রয়েছে, যা বলতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এখানে যে আকীদাগুলো উল্লেখ করা হলো, এর সবগুলো জনাব হাসান নাসরুল্লাহর অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশে রেয়েছে। কারও এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমরা তো আর তাকে কখনো সাহাবীদের গালাগাল করতে দেখিনি, কিংবা তিনি তো আমাদের সামনে কখনো উম্মুল মুমিনীনদের ওপর অপবাদ আরোপ করেননি।

এমন সরলমনা ভাইদের উদ্দেশে বলতে চাই, আসলেই তার আকীদা এমন কি না, তা নিজ কানে শুনে যাচাই করার প্রয়োজন নেই। কেননা, এসব আকীদা ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের একদম মৌলিক বিষয়।

আচ্ছা, আপনি কি কখনো আপনার প্রতিবেশী মুসলিম ভাইকে তাওহীদের কালিমা পড়তে শুনেছেন? ইা শুনলেও তো আপনি জানেন যে, অবশ্যই সে একত্ববাদে বিশ্বাসী, তাই না? কারণ, সে মুসলিম। ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের একজন অনুসারীর বিষয়টিও তেমনই। কোনো সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই তাকে উল্লিখিত সকল আকীদার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। নয়তো সে ওই মতাদর্শের অনুসারী বলেই গণ্য হবে না।

আর যদি হাসান নাসরুল্লাহ সাহাবীদেরকে সম্মান করেন, তবে তো তিনি ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের নীতিবিরোধী বলেই গণ্য হবেন; বিচ্যুত হবেন হযরত আলী ও তাঁর দুই পুত্রসহ তাদের সকল ইমামের (নামে তাদের বানোয়াট) আদর্শ থেকে।

তাহলে যে ব্যক্তির মাঝে এমন ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা রয়েছে, আমরা কি কোনোভাবেই তার অন্ধভক্ত হতে পারি? কিংবা তাকে মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? কখনই পারি না। তবে হ্যাঁ, তার মাঝে ভালো কিছু থেকে থাকলে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু সেটা এই অর্থে নয় যে তিনি মুসলমান। বরং এই অর্থে যে তিনি একজন বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান।

ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি, ক্রুসেডাররা যখন শাম ও ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালিয়েছিল, তখন ছিল শিয়াদের জয়জয়কার; মিশর ছিল উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে। নিজেদের এমন দুরবস্থায়ও কিন্তু তৎকালীন মুসলিম উম্মাহ কোনো শিয়া নেতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেনি; যদিও তারা তখন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি—সবকিছুতেই চরম উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বরং সুন্নী মুসলিম সেনানীরাই সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে

গেছেন; তাদের মাঝেই জন্ম নিয়েছেন ইমামুদ্দীন জিনকী, নুরুদ্দীন মাহমুদ এবং সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মতো মহান সিপাহসালারগণ।

এখন আমাদের উচিত হলো, এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। আমরা লক্ষ করলে দেখব, ইরান, ইরাক ও সিরিয়া নিয়ে শিয়াদের পরিকল্পনা একটু একটু করে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রেক্ষিতে সুন্নীরা কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে? তারা কি শিয়াদের বিবেচনায় নিজেদের উন্নতি ও অগ্রগতি নিয়ে একটুও চিন্তা করে?

সমগ্র ইসলামী বিশ্বে অনেক শাসক রয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্য থেকে আমরা এমন একজনকে বেছে নেব, যিনি সুন্নীদের জন্য সুমহান লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন; যিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুগামী হবেন; যিনি আমাদের মহান পূর্বসূরিদের অনুসারী হবেন; যিনি সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হবেন; যিনি ইরান, ইরাক, লেবানন ও সিরিয়ার নির্যাতিত সুন্নীদের পাশে দাঁড়াবেন; যিনি শক্ত হাতে ইহুদীদের যাবতীয় কুপরিকল্পনা এবং মুসলিম বিশ্বে শত্রুদের সকল আগ্রাসন রুখে দেবেন।

এই দায়িত্বগুলো নেওয়ার মতো কাউকেই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে মুসলিম উম্মাহকে আমরা আত্মশুদ্ধির প্রতি আহ্বান করব। বলব, আত্মসংশোধন করে নিতে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করতে, চোখের পানি ফেলতে। কোনো জাতিকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দেখলে তাদের কাছে একজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক পাঠাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শাসক নির্ধারিত হয় শাসিতের অনুপাতে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরমাণু পরিমাণ জুলুমও করেন না।

সুতরাং আসুন, আমরা আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হই, আল্লাহর দীনকে সাহায্য করি, তাহলে আল্লাহও আমাদেরকে বিজয়ী করবেন। চলুন, আল্লাহ কাছে ফিরে আসি, তাহলে আল্লাহও আমাদেরকে আপন কওে নেবেন, ক্ষমা করে দেবেন এবং সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

ইয়েমেনের ইতিবৃত্ত

ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলিম উম্মাহর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে যেসব ভূখণ্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য, সেসবের মাঝে ইয়েমেন অন্যতম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই ইয়েমেনীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় রেখেছিল অনন্য সাধারণ অবদান। ইয়েমেনী বীর মুজাহিদগণ ইসলামের বিজয়াভিযানগুলোতে অনুপম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শাম, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন ইত্যাদি দেশ জয়ের অভিযানে তাদের বৃহত্তম অবদান ছিল।

জিহাদের ময়দানের মতো ইলমের অঙ্গনেও ইয়েমেনবাসীর তাক লাগানো অংশগ্রহণ অব্যাহত ছিল। এমন অসংখ্য আলেম-ওলামা রয়েছেন যারা কেবল ইয়েমেনী জ্ঞানী-গুণীদের সান্নিধ্য পেতেই ইয়েমেন সফর করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের কথাই ধরুন না; ইলমে দ্বীনে পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি নেহায়েত দরিদ্রতা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে বাগদাদ থেকে ইয়েমেন গিয়েছেন। যেহেতু ইলমে দীনে পাণ্ডিত্য অর্জন তার কাছে ছিল সবচেয়ে বড়ো, তাই ভীষণ কষ্টের এ সফর তিনি নিজের জন্য আবশ্যক মনে করেছেন।

ইয়েমেন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা কেবল সেখানকার আলেম-ওলামা, মুজাহিদ-মুজতাহিদ এবং চিন্তাবিদদের গল্পেই সীমাবদ্ধ থাকব না, বরং সঙ্গে তুলে ধরতে চেষ্টা করব সমগ্র ইয়েমেন জাতির সার্বিক পরিস্থিতি। ইয়েমেনীদের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পৃথিবীর অন্যতম সুহৃদ ও বিনয়ী জাতি। না, না, এটি আমার কথা নয়;

স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন; যে সাক্ষ্য তাদের কাছে পার্থিব জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনা মুনাওয়ারায়; ইয়েমেন থেকে তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধিদল এলে তিনি বলেন,

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

'ইয়েমেনের অধিবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অত্যন্ত নরম দিল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ঈমান হলো ইয়েমেনীদের, হেকমত হলো ইয়ামানীদের।'[১]

এই হাদীসের প্রতিফলন আমি তাদের মাঝে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। আমার বিশ্বাস, এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মুজিযা। যতবার আমি ইয়েমেনে গিয়েছি, ইয়েমেনীদের সঙ্গে মিশেছি, প্রতিবারই তাদের আচরণ ও উচ্চারণ আমাকে কেবল নবীজির পবিত্র জবান নিঃসৃত গুণগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, তাদের কলব অত্যন্ত কোমল, তাদের হৃদয়জুড়ে আছে বিনয় আর বিনয়। বারবার আমি তাদের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখিয়ে দেওয়া কালিমা বলে দোয়া করেছি,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য শামে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য ইয়েমেনে বরকত দান করুন।[২]

ইয়েমেন আক্ষরিক অর্থেই এক গৌরবময় ভূমি।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৩৮৮
২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১০৩৭

ইয়েমেনে ইসলাম ধর্ম এবং যায়দিয়া মতাদর্শ

আমরা জানি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই ইয়েমেনে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয়। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিম উম্মাহর কাছে ইয়েমেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের এই অবস্থান খোলাফায়ে রাশেদিন থেকে নিয়ে উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল।

১৯৯ হিজরীতে আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুনের শাসনামলে কুফায় জনৈক যায়দিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম তবাতবা। তিনি তার চাচাতো ভাই ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদকে তার পক্ষে জনমত তৈরি ও সমর্থক বৃদ্ধির দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেন পাঠান।

যায়দিয়ারা মূলত যায়েদ ইবনু আলী ইবনু হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতাদর্শের অনুসারী। এরা যদিও শিয়া মতাদর্শের 'ব্যানারে' পরিচিত, কিন্তু সুন্নীদের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। এরা ইসনা আশারিয়া শিয়া তথা, ইরান, ইরাক, লেবানন এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা ও বিদআতী আমলের সংক্রমণ থেকে মুক্ত। পাশাপাশি তারা অন্যান্য মুসলিমদের মতোই কুরআন ও সুন্নাহর শাশ্বত বিধানগুলো মেনে চলে। যদিও ইমামত তথা নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গে আমাদের সহনীয় পর্যায়ের কিছু দ্বিমত রয়েছে।

তাদের মতে ইমামতের উত্তরাধিকার কেবল হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঔরসে হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সন্তান ও তাদের বংশধরদের। ইমামতের সাধারণ শর্তসমূহ তথা, ইলম, জ্ঞান, তাকওয়া-পরহেযগারিতা, বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা ইত্যাদি পাওয়া গেলে যে কেউ ইমাম হতে পারবে, তবে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বংশধর হওয়ার শর্তটি অবশ্যই পূরণ হতে হবে।

এ গুণগুলো কারও মাঝে সন্নিবেশিত হলে তাকে ইমামতের ঘোষণা দিতে হবে। এরপর জনসাধারণ তার কাছে বায়আত গ্রহণ করলে তার ইমামত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তারা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন

ইমামের ইমামতের বৈধতার পক্ষে। এজন্য ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য যায়দিয়া ইমামের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

সঙ্গত কারণে অনেক সুন্নী আলেম যায়েদ ইবনু আলী রহিমাহুল্লাহকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রথম সারির আলেম মনে করেন। অবশ্য তিনি ছিলেনও তেমনই একজন। সন্দেহ নেই, তিনি ইসলামী শরীয়তের মহান ইমামদের তালিকাভুক্ত। তিনি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন, সাহাবীদের প্রতি অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি লালন করতেন।

তিনি হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যথাযোগ্য সম্মান করতেন; তবে তাঁদের চেয়ে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা অধিক জ্ঞান করতেন। কিন্তু তার এই ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যদিও আপন স্থানে সম্মানিত, তবু বিভিন্ন কারণে শায়খদ্বয় তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী। তার মতে, অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তির উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবানও ইমাম হতে পারেন। তাই তিনি প্রথম দুই খলীফার খেলাফত অস্বীকার করতেন না।

এই একটি মূলনীতি ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায় এবং যায়দিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে বিশাল এক পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছে। কেননা, ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারীরা খলীফাদ্বয়ের খেলাফত স্বীকারই করে না। উপরন্তু তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে।

যায়দিয়ারা সুন্নীদের খুব কাছের

যায়দিয়া সম্প্রদায়কে যদিও শিয়া আখ্যায়িত করা হয়; কিন্তু শিয়াদের চেয়ে সুন্নীদের সঙ্গেই তাদের অধিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সুন্নীদের সঙ্গে তাদের এতটাই মিল যে, জিজ্ঞেস না করে বোঝার উপায় নেই। আমি ইয়েমেনে তাদের অনেকের সঙ্গে উঠাবসা করেছি। দেখেছি, তারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি রাখেন, তাদেরকে সম্মান করেন। তারা সুন্নীদের

মসজিদেই জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। ইসনা আশারিয়া শিয়াদের বিদআতী কার্যক্রম তাদের মাঝে একদম অনুপস্থিত।

এসব বিষয়ে আমি 'শিয়াদের গোড়ার কথা' এবং 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার' প্রবন্ধগুলোতে আলোচনা করে এসেছি। আনন্দের ব্যাপার হলো, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য এমন অনেক ইসলামিক স্কলারও রয়েছেন, যাদের কাছে অসংখ্য সুন্নী শিক্ষার্থী ইলমে দীনের পাঠ গ্রহণ করেছে। ইয়েমেনী যায়দিয়া আলেমদের মাঝে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন *নাইলুল আওতার* গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা শাওকানী রহিমাহুল্লাহ।

ফিরছি খলীফা আবদুল্লাহ আল-মামুনের যুগে... মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম তবাতবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষমও হয়েছিলেন; কিন্তু ইয়েমেনে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। সম্ভবত বাগদাদ থেকে ইয়েমেনের দূরত্ব এবং দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা ভৌগোলিক পরিবেশ তার সামনে স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। তা ছাড়া ইয়েমেনে বিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থার প্রচলন থাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বিস্তার যথেষ্টই কষ্টসাধ্য ছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি মাথায় রেখে খলীফা আল-মামুন কূটনীতিক কৌশল অবলম্বন করেন; ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদের হাতে ইয়েমেনের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এই শর্তে যে, তিনি খলীফার অনুগত থাকবেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। তার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় একশ পর্যন্ত ইয়েমেন আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে শাসিত হতে থাকে; পাশাপাশি এই সুদীর্ঘ সময়ে যায়দিয়া মতাদর্শের প্রচার-প্রসার ঘটতে থাকে আপন গতিতে।

এসব ঘটনার কয়েক দশক পরে, ২৮৪ হিজরীর দিকে আব্বাসী খেলাফত দুর্বল হয়ে এলে ইয়াহইয়া ইবনুল হাসান আল-রাসসী ইয়েমেনে স্বাধীন যায়দিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; যার নাম দেওয়া হয় 'বনু রাসসী'[১] সাম্রাজ্য বা আইম্মা সাম্রাজ্য। উত্তর ইয়েমেনের সা'দায় অবস্থিত

১. Rassids (بنو الرسي)

এই রাজ্যটি আব্বাসী খেলাফতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। আব্বাসী খেলাফতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী রাজ্যগুলোর মাঝে এটিই প্রথম নয়। এর আগে ২৩০ হিজরীতে 'বনু ইআফুর' বা 'ইআফুরীরা'[১] সানআকে রাজধানী করে স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল; যদিও তারা সুন্নীই ছিল।

ইয়েমেনে ইসমাঈলিয়া মতবাদ

ইয়েমেনে যায়দিয়া মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে 'রাসসী' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ইসমাঈলিয়া শিয়া সম্প্রদায়। তাদের অবস্থান ছিল দক্ষিণ ইয়েমেনে। ইতঃপূর্বে আমরা 'শিয়াদের গোড়ার কথা' এবং 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার' শিরোনামে এসব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। সেখানে বলেছি, ইসমাঈলিয়া শিয়ারা যারপরনাই ভ্রষ্ট ও উগ্র। তাদের সীমালঙ্ঘন এতটাই খতরনাক যে, অনেক আলেমই তাদেরকে অমুসলিম পর্যন্ত বলেছেন। দক্ষিণ ইয়েমেনজুড়ে ছিল তাদের ক্ষমতার বিস্তার। কিন্তু ২৯০ হিজরীতে হুটহাট অস্তিত্বে আসা এই সাম্রাজ্য অল্প কয়েক বছর পর ৩০৪ হিজরীতে মুখ থুবড়ে পড়ে। এভাবেই ইয়েমেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ফলে সানআয় গেড়ে ওঠে সুন্নীদের ইআফুরী সাম্রাজ্য, এবং সা'দায় যায়দিয়া শিয়াদের রাসসী সাম্রাজ্য। এ অবস্থায় কেটে যায় পুরো চতুর্থ শতাব্দী।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে এসে ইআফুরী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে যায়দিয়ারা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে; যদিও এরপরও মতাদর্শের মশাল নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকে। এমন সময় হঠাৎ চারদিক প্রকম্পিত করে ক্ষমতায় আসে সুন্নীদের 'বনু নাজাহ', বা 'নাজাহিদ'[২] সম্প্রদায়। পশ্চিম ইয়েমেনে যাবিদ অঞ্চলে গড়ে ওঠা 'নাজাহিদ' বা 'নাজাহী' সাম্রাজ্য, স্থায়িত্ব লাভ করে ৪০২ হিজরী থেকে ৫৫৫ হিজরী পর্যন্ত।

---

১. Yu`firids (بنو يعفر)

২. Najahid dynasty (بنو نجاح)

নাজাহিদ সাম্রাজ্যের চারপাশে একের-পর-এক গড়ে উঠে ভয়ংকর সব ইসমাঈলিয়া সাম্রাজ্য। এক. সুলাইহ বা সুলাইহিদ সাম্রাজ্য; শাসনাঞ্চল : সানআ; স্থায়িত্ব : ৪৩৯ হিজরী থেকে ৫৩২ হিজরী। দুই. যুরাইয় বা যুরাইডস সাম্রাজ্য; শাসনাঞ্চল : অ্যাডেন; স্থায়িত্ব : ৪৬৭ হিজরী থেকে ৫৬৯ হিজরী। তিন. হাতিম বা হামদানী সাম্রাজ্য; শাসনাঞ্চল : সানআ; স্থায়িত্ব : ৫৩৩ হিজরী থেকে ৫৬৯ হিজরী পর্যন্ত।

ইসমাঈলিয়া শিয়াদের সাম্রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিই কথিত ফাতিমী সাম্রাজ্য তথা, উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হতো। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, উবাইদিয়ারা একসময় ভয়ংকর ক্ষমতাধর ছিল। তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল মিশরজুড়ে; কখনো-বা শামে। যেহেতু ইসমাঈলিয়া সাম্রাজ্যগুলো উবাইদিয়াদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল, তাই তাদের পতনের পর একে-একে সবগুলোর পতন ঘটতে থাকে। আর ঐহিতাসিক এ ঘটনাগুলোর সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামী ইতিহাসের সুমহান ও সুপ্রসিদ্ধ বীর সিপাহসালার সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ূবীর নেতৃত্বে; ৫৬৭ হিজরীতে।

ইসমাঈলিয়া শাসনামল সমগ্র ইয়েমেনবাসীর জন্য ছিল ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো। যদিও পতন-পরবর্তী ইয়েমেন খুব দ্রুত সেই ঘোর কাটিয়ে ওঠে। সুন্নীদের আইয়ূবী সাম্রাজ্যের অধীনে একটি সুন্দর-সুশৃঙ্খল শাসনামলের সূচনা ঘটে। আইয়ূবী শাসনামলে সময়কাল ছিল ৫৬৯ হিজরী থেকে ৬২৬ হিজরী। তারপর ক্ষমতায় আসে সুন্নীদের 'বনু রাসূল' বা 'রাসূলিদ সম্প্রদায়'। সময়কাল ৬২৬ হিজরী থেকে ৮৫৮ হিজরী।

এতকিছুর পরও ইয়েমেন থেকে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটেনি। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইতিহাসের সকল যুগে তারা সা'দায় টিকে থেকেছে। এমনকি একটা সময়কে তাদের সোনালি যুগ অভিহিত করা যায়। ইতিহাসের পাতায় তা 'দ্বিতীয় রাসসী শাসনামল' নামে উল্লেখিত হয়েছে। যার সময়কাল ছিল ৫৯৩ হিজরী থেকে ৬৯৭ হিজরী। মূলত আইয়ূবী ও রাসূলিদ শাসনামলের মধ্যবর্তী সময়টি।

সানআর আইম্মা সাম্রাজ্য

হিজরী দশম শতাব্দীতে এসে সমগ্র ইয়েমেন উসমানী ও যায়দিয়া শাসকদের মাঝে বণ্টিত হয়। এই সুবাদে উসমানী শাসকরা ৯৪৫ হিজরী থেকে ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩৮৮ বছর সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাদের শাসনাঞ্চল ছিল মূলত দক্ষিণ ইয়েমেন। অপরদিকে যায়দিয়া রাসসী শাসকরা স্বাভাবিকভাবে সা'দায় তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে; সঙ্গে যুক্ত করে সানআ অঞ্চলটিও। এ কারণে এই সময়ে এসে এই সাম্রাজ্যের নাম পড়ে যায় 'সানআর আইম্মা সাম্রাজ্য'। এর সময়কাল ছিল ৯৭৩ হিজরী থেকে ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত মোট ৪০৯ বছর। যদিও উসমানী খেলাফতের সঙ্গে এক সংঘর্ষের পর ১৩৩৩ হিজরীতে যায়দিয়াদের যথাযথ পদক্ষেপ ইয়েমেনজুড়ে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ইয়েমেনে যায়দিয়া শাসকদের শাসনক্ষমতা চলতে থাকে ১৩৮২ হিজরী মুতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর ইয়েমেনী বিপ্লবের সূচনা ও পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে প্রথমবার ২৮৪ হিজরীতে ক্ষমতায় আসা যায়দিয়া শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে, যা টিকে ছিল এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যায়দিয়া মতাদর্শের শেকড় ইয়েমেন সমাজের অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুদীর্ঘকাল ধরে সেখানে তাদের ক্ষমতা কোনো-না-কোনোভাবে বিদ্যমান ছিল। তাদের আশপাশে গড়ে উঠেছে কখনো সুন্নী সাম্রাজ্য, কখনো-বা ইসমাঈলিয়া সাম্রাজ্য।

ওদিকে ইসমাঈলিয়ারা ইয়েমেনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তাদের শাসনামল ছিল মাত্র ১৩০ বছর। এবং এ সময়ে তারা কখনো সমগ্র ইয়েমেনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, ইয়েমেনে ইসনা আশারিয়া শিয়াদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। অপরদিকে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের

লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০ জন। এই তুলনায় ইয়েমেন সমাজে ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারী একবারেই তুচ্ছ। যদিও এ ব্যাপারে কোনো নিরেট পরিসংখ্যান রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এ পর্যায়ে আমরা 'হুতি'[১] বা 'হুথি' সম্প্রদায় সম্পর্কে জানব। এদের অবস্থান দক্ষিণ ইয়েমেনে; আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সা'দায়। উল্লেখ্য, এরা ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারী এবং ইরান তাদের সাহায্যকারী।

পরিশেষে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি,

এই ইসনা আশারিয়া শিয়ারা ইয়েমেনে এল কোত্থেকে? তারা এত শক্তি ও সাহস কীভাবে পেল যে, হুথি-দমনে ইয়েমেন সরকারের দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে হয়?

---

১. Houthis (الحوثيون)

হুথিদের কথা

গত পাঁচ বছর ধরে প্রধান প্রধান সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে হুথি-প্রসঙ্গ বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে জটিল; তবে এদের পক্ষে এবং বিপক্ষে এত বেশি আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে যে, প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে গেছে আলোচক, সমালোচক, সমর্থক ও বিরোধীদের ভিড়ে।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে হুথি কারা? এদের উত্থানই-বা কী কারণে? কী তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য? কেনই-বা ইয়েমেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল? এদের উত্থানের পেছনে বহির্বিশ্বের কি কোনো হাত আছে? থাকলে তা কতদূর?

পাঠক, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব। আশা করছি, নিম্নোক্ত আলোচনাটি একটি জটিল অধ্যায়ের সমাধানে সকলের জন্য সহায়ক হবে।

বিগত প্রবন্ধে তথা 'ইয়েমেনের ইতিবৃত্তে' আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইয়েমেন শাসনের ইতিহাস তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, যায়দিয়া শিয়ারা সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়েমেন শাসন করেছে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হওয়া ইয়েমেনী বিপ্লব পর্যন্ত ইয়েমেনে তারাই ছিল সর্বেসর্বা।

সেখানে আমরা আরও দেখেছি ইয়েমেনে চর্চিত যায়দিয়া মতাদর্শ এবং ইরান, ইরাক ও লেবাননে অনুসৃত ইসনা আশারিয়া মতবাদের মাঝে থাকা যাবতীয় পার্থক্য। এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিগত কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন, 'শিয়াদের গোড়ার কথা', 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির

বিস্তার', 'শিয়াদের নিয়ে শঙ্কা' এবং 'শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান' এ খোলামেলা আলোচনা করেছি।

বিগত প্রবন্ধে আমরা আরও বলে এসেছি, ইসনা আশারিয়া বা ইমামিয়া শিয়াদের চেয়ে সুন্নীদের সঙ্গেই যায়দিয়াদের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। বরং তাদের উভয়ের মাঝে বড়ো ধরনের কিছু বিরোধও রয়েছে। ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অনুসারীরা যায়দিয়া মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা যায়েদ ইবনু আলীর ইমামত স্বীকার না করার বিষয়টি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে ইসনা আশারিয়াদের আকীদাগত ভয়ংকর সব বিদআত তো আছেই, সাথে আরও অনেক বিষয়েই যায়দিয়ারা তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে থাকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : ইমামদের সংখ্যা বারোতে সীমাবদ্ধ রাখা; তাদেরকে নিষ্পাপ আখ্যায়িত করা; তাকিয়া, বাদায়াহ[১] ও পুনর্জীবনের আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া; সাহাবীদের গালাগাল করা ইত্যাদি।

পরিশেষে আমরা এ-ও বলেছি যে, ইতিহাস ঘেঁটে ইয়েমেনের ইসনা আশারিয়া শিয়াদের অস্তিত্বই আবিষ্কার করা যায়নি। সুতরাং ইদানীং সেখানে তাদের যে তোড়জোড় চোখে পড়ছে, এর সূচনা বেশিদিন আগের নয়। আর এর সাথে হুথিদের রয়েছে গভীর সম্পৃক্ততা। চলুন এবার আমরা সেদিকেই আগাই...

গোড়ার কথা

ঘটনার সূত্রপাত হয় রাজধানী সানআ থেকে ২৪০ কি.মি. দূরে অবস্থিত সা'দা শহরে। যায়দিয়াদের বড়ো একটি অংশ সেখানেই বসবাস করে। ধর্মীয় মতাদর্শ পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালে তারা 'ইত্তেহাদুশ শাবাব' বা 'যুব পরিষদ'[২] নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

---

১. Bada' (البداءة أو البداء)

২. Youth Union (إتحاد الشباب)

যায়দিয়া মতাদর্শের তৎকালীন শীর্ষ আলেম জনাব বদরুদ্দীন হুথি ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান।

১৯৯০ সালে ইয়েমেনী ঐক্য সংঘটিত হয়। এতে সকল দল ও সংগঠনের সামনে চিন্তা-ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। এই সুযোগে 'ইত্তেহাদুশ শাবাব' নিজেদের নাম বদলে হয় যায় 'হিযবুল হক' বা 'সত্যের দল'[১]। এই নামে তারা সমগ্র ইয়েমেনে যায়দিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে।

এ সময় জনাব বদরুদ্দীন হুথির ছেলে হুসাইন বদরুদ্দীন হুথির নেতৃত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনদিন তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এই সুবাদে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৭ সালে তিনি ইয়েমেন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

ঘটনার এক বাঁকে যায়দিয়ারা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। সে এক ঐতিহাসিক ফতোয়ার ঘটনা, যাতে বদরুদ্দীন হুথি নিজ ঘরনার আলেমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তখন ইয়েমেনের 'জমহুর' ওলামায়ে কেরামের মুখপাত্র ছিলেন জনাব মাজদুদ্দীন আল-মুয়াইদী।

শায়খ মাজদুদ্দীন ফতোয়ায় বলেন, ইমামতের জন্য হাশেমী গোত্রভুক্ত হওয়ার যে শর্ত ছিল, তা আর এ যুগে প্রযোজ্য নয়। মূলত সেটির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণের অধিকার আছে যে, তারা চাইলে উপযুক্ত যে কাউকে ইমাম নির্ধারণ করতে পারে—চাই সে হযরত হাসান বা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বংশধর হোক, বা না হোক।

জনাব বদরুদ্দীন হুথি ছিলেন যায়দিয়ার শাখা 'জারুদিয়া'[২] সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। চিন্তা-চেতনায় এই সম্প্রদায় ছিল ইসনা আশারিয়া মতাদর্শ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। মূলত এ কারণেই তিনি উল্লিখিত ফতোয়ার জোরালো বিরোধিতায় লিপ্ত হন।

---

১. Party of Truth (حزب الحق)

২. الجارودية

বিষয়টি তার সঙ্গে অনেকদূর গড়ালে একপর্যায়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসনা আশারিয়া মতবাদের পক্ষাবলম্বন শুরু করেন। শুধু তা-ই নয়, *আয-যায়দিয়া ফিল ইয়ামান* নামে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন; যাতে তিনি ইসনা আশারিয়া শিয়াদের সঙ্গে যায়দিয়া শিয়াদের সুসম্পর্কের সকল কারণ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। বস্তুত এতে তিনি যায়দিয়া মতাদর্শ বাদ দিয়ে যে ভ্রান্ত মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে সর্বাত্মক সাফাই গাওয়ার প্রয়াস পান। কেননা, একসময় তাকে দেশ ত্যাগ করে তেহরান যেতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং সেখানে কাটাতে হয়েছে অনেকগুলো বছর।

বদরুদ্দীন হুথি ইয়েমেন ছেড়ে চলে গেলেও তার চিন্তাচেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে আপন গতিতে; বিশেষত সা'দা শহরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে।

নব্বইয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল; বিশেষ করে ১৯৯৭ সালে যেন জোয়ার এসেছিল। এই সময় বদরুদ্দীন হুথির ছেলে হুসাইন বদরুদ্দীন হুথি হিযবুল হক থেকে আলাদা হয়ে যান। এবং নিজের মনোমতো একটি দল গঠন করেন।

এর শুরুটা ছিল ধর্মীয়, আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক দল হিসেবে। বরং উদ্দেশ্য এ-ও ছিল যে, 'আল-ইসলাহ' সংগঠনের 'ব্যানারে' সুন্নীদের যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, তা প্রতিহত করতে তারা ইয়েমেন সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই দলটি সরকারের বিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং ২০০২ সালে বিষয়টি প্রথম প্রকাশ পায়।

এরই মধ্যে ইয়েমেনের কয়েকজন গণ্যমান্য আলেম, বদরুদ্দীন হুথিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি জনাব আলী আবদুল্লাহ সালেহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলে বদরুদ্দীন হুথি ইয়েমেনে ফিরে আসেন। এই সুযোগে তিনি তার অনুসারীদের মাঝে নতুনভাবে তার মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে কোমড়ে গামছা বেঁধে নামেন।

ইয়েমেন সরকার তখন এ দলটির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করেনি; ভাবেনি, খাল কেটে এক কুমির আনা হয়েছে, যা একদিন তাকে গ্রাস করতে তার দিকে হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দেবে।

বিশাল বিক্ষোভ এবং যুদ্ধের সূচনা

২০০৪ সালে ঘটে যায় মহাকাণ্ড। হুসাইন বদরুদ্দীন হুথির নেতৃত্বে হুথি সম্প্রদায় মার্কিনীদের ইরাক-আগ্রাসনের বিরোধিতা করে ইয়েমেনের মহাসড়কগুলোতে বিশাল বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। এসব নিয়ে ইয়েমেন সরকার বড়োসড়ো ঝামেলার সম্মুখীন হয়।

এরপর জানা যায়, জনৈক হুথি নিজেকে ইমাম এবং মাহদী দাবি করেছে। এমনকি নবুওয়তের দাবিও নাকি করেছে তাদের একজন। এসব দেখে ইয়েমেন সরকার নড়েচড়ে বসে এবং একপর্যায়ে হুথি শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধে ত্রিশ হাজারেরও বেশি ইয়েমেনী সেনা অংশগ্রহণ করে; ব্যবহৃত হয় ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধবিমান। প্রথম সংঘর্ষেই সংগঠনের প্রধান হুসাইন বদরুদ্দীন হুথি নিহত হন, কয়েকশ হুথি যোদ্ধা বন্দি হয়, সরকারের হস্তগত হয় এক বিশাল অস্ত্রভান্ডার। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। হুসাইন বদরুদ্দীন হুথির অনুপস্থিতিতে সংগঠনের হাল ধরেন তার বাবা বদরুদ্দীন হুথি।

এদিকে রাষ্ট্রের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা আগেই বড়ো ধরনের সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল; যা দিয়ে তারা ইয়েমেনী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে টানা কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কাতার ২০০৮ সালে হুথি সম্প্রদায় এবং ইয়েমেন সরকারের মাঝে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয়। এই সুবাদে একটি শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির পরপর হুসাইন বদরুদ্দীন হুথির দুই ভাই ইয়াহইয়া হুথি এবং আবদুল কারীম হুথি তাদের অস্ত্রশস্ত্র ইয়েমেন সরকারের কাছে হস্তান্তর করে কাতারে পারি জমায়।

কিন্তু এ চুক্তি ছিল একেবারে ক্ষণস্থায়ী, যা ভেঙে গেলে আবার নতুনোদ্যমে যুদ্ধ বাধে। এবার তাদেরকে আরও শক্তিশালী দেখা যায়; ধীরে ধীরে তারা সা'দার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এমনকি ইয়েমেনের বাইরে থেকে সমুদ্রপথে সাহায্য লাভের জন্য তারা লোহিত সাগরের উপকূলে নিজেদের ঘাঁটি করতে সচেষ্ট হয়।

এখন আর কোনোকিছুই অস্পষ্ট নেই; সবই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সুতরাং সমগ্র ইয়েমেনে কাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেটাই এখন লক্ষণীয়; কয়েকটি জেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে শিয়াদের হাতে গেল কি-না, তা ধর্তব্য নয়।

হুথিদের ক্ষমতার উৎস

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য যদিও অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করা সম্ভব; কিন্তু সঙ্গত কারণেই কয়েকটি উল্লেখ করছি মাত্র। আশা করি, এতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত : এ বিষয়টি কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ইয়েমেনের ছোট্ট একটি জেলায় অবস্থানরত কিছু লোক কোনো রকম বহিস্থ সহায়তা ছাড়াই বছরের পর বছর রণাঙ্গনে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। এর সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে, হুথি বিদ্রোহীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কেবল একটি দেশেরই লাভ; দেশটি হলো ইরান।

ইরান একটি ইসনা আশারিয়া শিয়া রাষ্ট্র; তাই যে-কোনো মূল্যেই হোক সমগ্র বিশ্বে তারা এ মতবাদ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট। সুতরাং যদি তাদের পক্ষে কোনোভাবে ইয়েমেনে হুথিদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়, তবে সেটি তাদের জন্যও একটি বড়ো অর্জন বলে গণ্য হবে। বিশেষত, এর মাধ্যমে তাদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র সৌদি আরবকে কোণঠাসা করতে পারবে। কেননা তখন উত্তরে ইরাক, পূর্বে সৌদি-পূর্বাঞ্চল, কুয়েত, বাহরাইন এবং দক্ষিণে ইয়েমেন দ্বারা বেষ্টিত সৌদি আরব একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে; যা আমেরিকা কিংবা সুন্নী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে ইরানের জন্য সৃষ্টি করবে এক বিশাল সুযোগ।

এটি কেবল ধারণাপ্রসূত কিংবা কোনো কাল্পনিক বক্তব্য নয়; এই দাবির পক্ষে একাধিক দলীলও রয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, রহস্যজনকভাবে জনাব বদরুদ্দীন হুথির মধ্যপন্থি যায়দিয়া মতাদর্শ ছেড়ে উগ্রপন্থি ইসনা আশারিয়া মতবাদে যোগদানের বিষয়টি। তিনি চকিত মতাদর্শ পরিবর্তন করে ফেললেন, অথচ ইয়েমেনের ইতিহাসজুড়ে কোথাও ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না।

মতাদর্শ পরিবর্তনের পর ইরান তাকে একেবারে কোলে তুলে নিল; কয়েক বছর পর্যন্ত তেহরানে তাকে মেহমানদারিও করল। এ সময় বদরুদ্দীন হুথি দেখতে পান—ক্ষমতার মসনদে আরোহণের জন্য খোমেনী কর্তৃক প্রবর্তিত 'বিলায়াতুল ফাকীহ' আকীদা চমৎকার এক সিঁড়ি, যাতে রয়েছে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বংশধর না হয়েও ক্ষমতাপ্রাপ্তির সহজ ব্যবস্থা; অথচ যায়দিয়া মতাদর্শে এমন কিছু কখনই ছিল না।

এসব ছাড়াও একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে ইরানের জন্য কোনো ভিন্নদেশি রাষ্ট্রদ্রোহীকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক সহায়তা প্রদান করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। সর্বোপরি হুথি ইস্যুতে ইরানের পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে ইরানের বিভিন্ন শিয়া সংবাদসংস্থা এবং 'আল-আলাম' ও 'আল-কাউছারে'-র মতো টেলিভিশন চ্যানেলের প্রচারণার মাধ্যমেই নিশ্চিত হওয়া গেছে।

তা ছাড়া ইসনা আশারিয়া শিয়া মতাদর্শের অনুসারী, ইরাকের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সিসতানীর কাছে হুথিরা মধ্যস্থতা কামনা করেছিল। এমনকি একটা সময় তিনি ইয়েমেনীদের কাছেও ছিলেন বিস্ময়-পুরুষ; যার হেতু ছিল বিদ্রোহাত্মক মানসিকতার পক্ষাবলম্বন।

এরপর কথা হলো, ইয়েমেন সরকার একবার তাদের অস্ত্রভান্ডারের উৎস সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছিল; বিশেষত হুথিদের ব্যাপারে; তখন দেখা গেছে সেগুলো সব ইরানের তৈরি। এরপর ইয়েমেন সরকার প্রচ্ছন্নভাবে হলেও হুথিদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারের ইরানের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করেছিল; কিন্তু ইরান সরকার অকৃত্রিমভাবেই সেটি অস্বীকার করেছে।

এটি যে তাদের রাজনৈতিক চাল, তা কি আর বলে বোঝাতে হয়!? আর ইসনা আশারিয়া শিয়াদের 'তাকিয়া' আকীদা প্রয়োগের সুযোগ তো থাকছেই—যা তাদেরকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েই রেখেছে। তো, আর চিন্তা কী!?

দ্বিতীয়ত : হুথিদের এই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পেছনে আরও যে বিষয়টি ইন্ধন জুগিয়েছে তা হলো, আন্দোলনের প্রতি অধিকাংশ ইয়েমেনীদের ব্যাপক সমর্থন। দুঃখজনক হলেও সত্য, ওই এলাকার মানুষ হুথিদের ভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও কেবল সেখানকার রাজনৈতিক সঙ্কট এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি পেতেই তাদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

তা ছাড়া ইয়েমেনের অবকাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র—এটাও সত্য; কিন্তু ওই অঞ্চলের মানুষেরা যেন হতদরিদ্র। সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছোটো ও বড়ো শহরগুলোর মাঝে যে বৈষম্য, তা-ও লক্ষণীয়।

২০০৮ সালে কাতারের মধ্যস্থতায় ইয়েমেন সরকার ও হুথিদের মাঝে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির দিকে তাকলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, ইয়েমেন সরকার অচিরেই সা'দার উন্নয়নে সার্বিক পদক্ষেপ নেবে, এবং কাতার সেসব উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নও করবে; কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে সকল পরিকল্পনা স্থগিত থাকে। সর্বোপরি প্রত্যক্ষদর্শন হলো, নানাভাবে বৈষম্যের শিকার এবং উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তোলায় জন্য একসময় এমন সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলায়, যাদের সঙ্গে তাদের নৈতিক, আদর্শিক এবং বিশ্বাসগত কোনো মিল নেই।

তৃতীয়ত : এই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পেছনে ইয়েমেনজুড়ে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকেও দায়ী করা যায়। কেননা ইয়েমেন মানেই অসংখ্য সম্প্রদায় ও অগণিত গোষ্ঠীর সহাবস্থান; আর যেখানে সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য থাকবে সেখানে সাদৃশ্য নিরূপণের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, হুথি বিদ্রোহীরা বরাবরই সরকার-বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে আসছে। কোনো রকম নৈতিক ও আদর্শিক সম্পর্ক ছাড়াই হুথিদের প্রতি তাদের এই দুর্বলতার একমাত্র কারণ ছিল প্রচলিত শাসনব্যবস্থা, যা তাদের মনে ক্ষোভ তৈরি করেছিল।

চতুর্থত : ইয়েমেনের পাহাড়ি ভূ-প্রকৃতিও বিদ্রোহীদের জন্য ছিল যথেষ্ট সহায়ক; অপরদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে ওই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল অনেকটা অসম্ভব। কারণ, একদিকে হুথিদের ছিল অসংখ্য গোপন আস্তানা ও গুহা; অপরদিকে সেনাবাহিনীর ছিল ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ, পাহাড়ি পথঘাট সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং সূক্ষ্মভাবে অবস্থান নির্ণয়কারী বৈজ্ঞানিক 'ডিভাইস' ও 'স্যাটেলাইট' এর অনুপস্থিতি।

পঞ্চমত : ইয়েমেন সরকারের বড়ো একটি ভুল ছিল এই যে, তারা ইয়েমেনকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিখণ্ডিত করতে চাওয়ার ইস্যুতে সমাধানের দিকে না গিয়ে বরং জিইয়ে রেখেছে। এই দাবির পক্ষে সংঘটিত বিক্ষোভ সমাবেশের বিরুদ্ধে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি; এমনকি ইয়েমেনের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আলী সালিম আল-বাইদ—যিনি ছিলেন দক্ষিণ ইয়েমেনের অধিবাসী—লন্ডনে বসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও তার ব্যাপারে তারা নিশ্চুপই থেকেছে।

বলাবাহুল্য, এ সিদ্ধান্ত ইয়েমেনের সরকার, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে; যে কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হুথিদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।

ষষ্ঠত : এই বিদ্রোহ দীর্ঘায়িত হওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, ইয়েমেন সরকার নিজেই চাচ্ছিল এই বিদ্রোহ অব্যাহত থাকুক। তাদের পরিকল্পনা ছিল, এই ইস্যু দেখিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক সহায়তা লাভ করবে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ লাভ, যা তারা 'সন্ত্রাস

দমনের' নামে বিভিন্ন দেশে করে থাকে। এ লক্ষ্যে আমেরিকা আল-কায়েদা ও হুথিদের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে বলে ইঙ্গিতও করে।

আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো, নৈতিক ও আদর্শিক দিক থেকে আল-কায়েদা ও হুথিদের অবস্থান পৃথিবীর দুই মেরুতে। কারণ, আল-কায়েদার মতাদর্শ ইসনা আশারিয়া মতবাদের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। সুতরাং এদের মাঝে কোনো রকম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা অমাবস্যার রাতে চাঁদ উদিত হওয়ার মতো। উপরন্তু এ কথা তো সকলেরই জানা, ইসলামী বিশ্বের সবখানে নাক গলানো আমেরিকার আজন্ম স্বভাব; এসব কুবাসনা পূরণে সব ধরনের দলীল-প্রমাণ পেশ করতেও তারা সদা প্রস্তুত।

এদিকে ইয়েমেন কামনা করছিল, এই সুযোগে তারা তাদের থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে; সেটা যদি সম্ভব না-ও হয়, অন্তত স্বৈরশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা এমন কোনো 'ট্যাগ' যেন পশ্চিমারা তাদের প্রতি না লাগায় সেই বন্দবস্ত হয়ে যাবে।

তা ছাড়া আমেরিকার সঙ্গে ভালো সম্পর্কের দরুন সৌদি আরবের সঙ্গেও বন্ধুত্ব তৈরি হবে; হুথি-দমন পরিকল্পনায় ইয়েমেনকে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করবে। এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তবে হয়তো সৌদি আরবের পাশাপাশি কাতার, দুবাইসহ অন্যান্য রাষ্ট্রও তাদের দিকে সাহায্যের প্রসারিত করে দেবে।

এসব বিষয় যদি আমরা ভুলেও যাই, তবু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ইয়েমেনের সমস্যা এখনো বিদ্যমান এবং পরিস্থিতি যথেষ্ট নাজুক। এমতাবস্থায় ইয়েমেন সরকারের কর্তব্য হলো, সবকিছুতে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া; বিশেষত, ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনার প্রসারে কাজ করে যাওয়া এবং সব ধরনের বৈষম্য দূর করে ওই অঞ্চলের মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বেরও কিছু করণীয় রয়েছে। তাদের উচিত এই বিপদে ইয়েমেনের পাশে দাঁড়ানো। নয়তো সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন সমগ্র ইসলামী বিশ্ব শিয়াদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে।

এরচেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইয়েমেন জাতির উচিত নিজেদের হিসেব নিজেরাই কষা; স্বদেশের কল্যাণ কোন পথে—সেই চিন্তা করা। মনে রাখতে হবে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিশুদ্ধ চেতনা ধারণ করা, কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। এ ছাড়া অন্যকোনো উপায়ে এই সমস্যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না।

ইরানের শাসনব্যবস্থা

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনপ্রক্রিয়া দেখে মুসলিম উম্মাহর অনেকেই উচ্ছ্বসিত হন; তারা মনে করেন, এমন সুষ্ঠু নির্বাচনই পারে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি উপহার দিতে, যার মাধ্যমে জনগণের আশার প্রতিফলন ঘটবে। বিশেষত আরব বিশ্বজুড়ে যেভাবে স্বেচ্ছাচারিতার ছড়াছড়ি, তাতে এমন কিছু ভাবনায় আসাটা খুব স্বাভাবিক।

বস্তুত, অধিকাংশ আরব দেশের শাসকগোষ্ঠী জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো পরোয়া করে না। এমনকি কখনো কোনো দেশে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েও থাকে, সেটা হয় নিতান্তই পাতানো। এসব কারণে আরব জনসাধারণ কোনো রকম বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে; এমনকি এ খবরও নেই যে, এসব কাদের কারসাজি। পশ্চিমাদের, শিয়াদের, নাকি অন্য কারও!

আচ্ছা, ইরানের নির্বাচনপ্রক্রিয়া কি সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক বা অনুসরণীয়? ইরানী জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের কি সত্যি এতটা যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে, যদ্দ্বারা জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হতে পারে? সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কি দেশ ও দশের কল্যাণে কোনোও ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে? সত্যিই কি ইরানের শাসনব্যবস্থা অতটা প্রাণবন্ত, যতটা শিয়াদের প্রতি মুগ্ধ জনতার আলাপচারিতায় উঠে আসে?

সত্যিকার অর্থে ইরানের শাসনব্যবস্থা এবং প্রকৃত শাসনকর্তা কে—তা বুঝতে আমাদেরকে একটু শুরুর দিকে যেতে হবে।

প্রিয় পাঠক, এ পর্যায়ে আপনার প্রতি আমার বিনীত পরামর্শ থাকবে, এ বিষয়ে বইটির প্রথম দিকের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে নিতে; বিশেষত 'শিয়াদের গোড়ার কথা', 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার', 'শিয়াদের নিয়ে শঙ্কা'—প্রবন্ধগুলো।

খোমেনীর একনায়কতন্ত্র

১৯৭৯ সালে জনাব খোমেনী বিপ্লবের ডাক দেন। এর মাধ্যমে তিনি ইরানের সাবেক রাষ্ট্রনায়ক শাহ পাহলভীকে পদচ্যুত করেন। ইরানের ইতিহাসে শাহ পাহলভী ছিলেন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী; কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে বিশেষ পারদর্শী।

তার পতনের পর খোমেনীর শাসন আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি কী করেছিলেন? বলাবাহুল্য, একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তিনি ছিলেন শাহ পাহলভীর চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে; ক্ষমতা কুক্ষিগত করার বিবেচনায় শাহকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বহুদূরে। শাহের শাসনামলে জনগণ তবু একটু-আধটু আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ পেত। কিন্তু খোমেনীর জমানায় এসে তা যেন একেবারে নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল।

তাহলে আমরা যে মাঝেমধ্যে তর্ক-বিতর্ক, প্রতিরোধ-প্রতিবাদ দেখি এসব তাহলে কীভাবে সম্ভব? বস্তুত, এসব নিতান্তই লোকদেখানো, যার আসল উদ্দেশ্য শাসকগোষ্ঠী ও শাসনব্যবস্থার প্রতি সকলের সুদৃষ্টি লাভ করা; বোঝাতে চাওয়া—দেশে সুশাসনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, জনগণের প্রতিটি মত সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো?

শিয়াদের ইতিহাস সামনে রেখে জনাব খোমেনী প্রথমে 'বিলায়াতুল ফাকীহ' নামে একটি নতুন আকীদা বা চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন। সেই সুবাদে তিনি ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

শিয়া মতাদর্শের মূলনীতি হলো, 'বিলায়াত' তথা 'সমগ্র জাতির নেতৃত্ব বা অভিভাবকত্ব' কেবল একজন নিষ্পাপ ইমামের কাঁধেই অর্পিত

হতে পারে। তাদের বিশ্বাস—হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর পুত্র হযরত হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এবং পর্যায়ক্রমে হযরত হুসাইনের উত্তরসূরিরা সকলে নিষ্পাপ। আর তাদের থেকেই তারা বারোজনকে নিজেদের ইমাম নির্ধারণ করে নিয়েছে।

তাদের এগারোতম ইমাম হলেন হাসান আল-আসকারী; যিনি ২৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে উত্তরসূরি হিসেবে তিনি কাউকে কথিত 'নিষ্পাপ ইমাম' নির্ধারণ করে যাননি। এ নিয়ে বড়োসড়ো এক সমস্যার সৃষ্টি হয়; যার সমাধান করতে গিয়ে তারা হয় শতধাবিভক্ত।

এ সময় ইসনা আশারিয়া দলের নেতারা দাবি করে বসেন, ইমাম আসকারী তার পাঁচ বছরের শিশুপুত্রের ব্যাপারে ওসিয়ত করে গেছেন; কিন্তু এই শিশুটি কোনো এক অজনা গুহায় আত্মগোপন করে আছে। লেবানন, ইরানসহ আরও যত দেশে ইসনা আশারিয়া শিয়া আছে সকলেরই একই বিশ্বাস—সেই শিশুটি এখনো গুহাভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে; একদিন-না-একদিন সে বেরিয়ে আসবে এবং সমগ্র দুনিয়া শাসন করবে। এ শিশুই তাদের কাছে প্রতিশ্রুত ইমাম, মাহদী।

শিয়াদের আকীদা অনুযায়ী শাসনভার গ্রহণ করা, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন করা, সংঘবদ্ধ হওয়া, জিহাদ করা, হুদুদ কায়েম করা ইত্যাদি আমলগুলো নিষ্পাপ ইমামের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। তাদের কল্পনাপ্রসূত ওই ইমাম যতদিন অনুপস্থিত থাকবে, ততদিন এ আমলসমূহ রহিত থাকবে। কী অদ্ভুত!

বিলায়াতুল ফাকীহ

খোমেনী কর্তৃক প্রবর্তিত 'বিলায়াতুল ফাকীহ' কথাটির অর্থ হলো 'আত্মগোপনে থাকা নিষ্পাপ সেই ইমাম মাহদী অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবেন; তার অনুপস্থিতির সময়টুকুর জন্য তিনি একজন "ফকীহ" বা "ধর্মীয় নেতা"-র হাতে যাবতীয় দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যিনি যে-কোনো বিধিনিষেধ জারি করার অধিকার রাখেন, যা সর্বজনীন এবং স্বয়ং নিষ্পাপ ইমাম উপস্থিত থাকলে এটিই করতেন।'

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধর্মীয় নেতা জাতির সর্বোচ্চ অভিভাবক, কথিত নিষ্পাপ ইমামের সমমর্যাদার ধারক। ইমামের মতো তিনিও নিষ্পাপ, তার কাছেও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা (ইলহাম) আসে এবং তার মর্যাদাও নবীদের থেকে বেশি। কারণ, তাদের মতে নবীদের আগমন একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ছিল; পক্ষান্তরে নিষ্পাপ ইমামের জিম্মাদারি আজও বহাল।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, খোমেনী তার *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া* গ্রন্থে বলেছেন : 'আমাদের মতাদর্শের ইমামরা মর্যাদার যে স্তরে উন্নীত হয়েছেন, কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলও সে স্তরে পৌঁছতে পারেননি।'[১]

ইরানের জনগণ এই মতাদর্শ গ্রহণ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অভিভাবকের ওপর কোনো রকমে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ আর নেই। তিনি এখন 'সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা', 'বিপ্লবী নেতা', 'নেতা'-সহ বিভিন্ন উপাধিতে জর্জরিত। ইরানের নতুন নীতি অনুযায়ী এ সবগুলো উপাধি সমার্থবোধক এবং শুধু একজনের জন্যই প্রযোজ্য।

নিঃসন্দেহে এটি একটি ভয়ংকর ব্যাপার। এর ভয়াবহতা আরব দেশগুলোর নষ্ট রাষ্ট্রনীতির চেয়েও অনেক বেশি। কেননা, আরব দেশগুলোতে যে শাসকগোষ্ঠী একনায়কতন্ত্র কায়েম করে রেখেছে, তারা কিন্তু এই দাবি করে না যে তারা আল্লাহর নামে শাসন করছে বা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত হয়, বা তারা নিষ্পাপ।

তা ছাড়া, সেসব দেশের জনগণের কাছে শাসকের বিরুদ্ধাচরণ শরীয়তের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য নয়। বরং তাদের অনেকেই মনে করেন, অন্যায় আর কর্তৃত্ববাদের মোড়কে আবৃত একনায়কতন্ত্রের এ শাসনব্যবস্থা ছুড়ে ফেলতে পারাই কল্যাণকর। অপরদিকে, ইরানে শাসক বা শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করা ধর্মদ্রোহিতার অন্তর্ভুক্ত।

---

১. খোমেনী কৃত *আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া*; পৃষ্ঠা : ৫২

খোমেনী ক্ষমতায় আসার পর নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি এ একনায়কতন্ত্র নিজের এবং ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করে দেন। এই মর্মে তিনি সংবিধানে একটি ধারা যুক্ত করেন যে, ইরানী বিপ্লবের অগ্রদূত আজীবন এই পদে বহাল থাকবেন।

এরপর তিনি 'মাজলিসুল খুবারা' বা 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'[১] নামে একটি বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডের সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। কিন্তু পদপ্রার্থীকে অবশ্যই ফকীহ হতে হবে, ইসনা আশারিয়া মতাদর্শের হতে হবে এবং 'বিলায়াতুল ফকীহ' চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হতে হবে।

এই বোর্ডই খোমেনীর মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করবে, যিনি আবার আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকবেন। এই বোর্ডের সিদ্ধান্তমতে ১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ আল-খামেনেয়ী বিপ্লবের পথপ্রদর্শক নির্বাচিত হন এবং এখন পর্যন্ত তিনিই ওই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পদচ্যুতি

খোমেনীর ক্ষমতার তৃষ্ণা এতেও মেটেনি; রাষ্ট্রের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদের কলকাঠি নিজের কব্জায় রেখেই তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। সংবিধানের ১১০ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে, বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখবেন; বিশেষত সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে যে-কোনো রদবদল করতে পারবেন। তিনিই সশস্ত্রবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ এবং তার ইচ্ছায়ই রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের প্রধানদের নিয়োগ-বিয়োগ কার্যকর হবে। তিনিই প্রধান বিচারপতি, রেডিও-টেলিভিশন সংস্থার প্রধানের নিয়োগ দেবেন। তার সিদ্ধান্তেই সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং বিপ্লবের প্রধান কমান্ডার নির্ধারিত হবে। এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো, তিনি চাইলেই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দিতে পারবেন।

আসলে খোমেনী সকল ক্ষমতা এমনভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছেন যে, আরব-একনায়কতন্ত্রের কেউ তা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি।

---

১. Assembly of Experts (مجلس الخبراء)

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আপনি জেনে অবাক হবেন, খোমেনী যা কিছু করেন, এর সবই নাকি ইমাম মাহদীর দেওয়া ক্ষমতাবলেই করেন। তাই সাধারণ কেউ সেসবের বিরুদ্ধাচরণ করল, তো সে যেন শিরক করে ফেলল! কারণ সে নিষ্পাপ ইমামের ওপর আপত্তি তুলেছে, যে ইমামের কাছে স্বয়ং আল্লাহর ইলহাম আসে।

এই ভ্রান্ত আকীদাটিকে তারা ইমাম জাফর আস-সাদিকের নামে চালিয়ে দেয়। তিনি নাকি বলেছেন : 'কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার পরও যদি কেউ তা অগ্রাহ্য করে, তবে যেন সে আল্লাহর বিধানের প্রতিই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করল। আর আমাদের বিরুদ্ধাচরণ মানে তো আল্লাহরই বিরুদ্ধাচরণ। সুতরাং তা শিরক।'[১]

এহেন পরিস্থিতিতে খোমেনীর প্রতি আপনার ক্ষোভ আসতে পারে। কিন্তু তিনি বড়ো বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন; ক্ষমতার এই লীলাখেলা তিনি খুব সহজেই লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গেছেন। তিনি যে একজন প্রতাপশালী সর্বাধিনায়ক, কাউকে তা বুঝতেই দেননি।

খামেনী 'রাঈসুল জামহুরিয়াহ' বা 'প্রজাতন্ত্রের প্রধান'[২] নামে একটি পদ সৃষ্টি করেছেন; যদিও সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাই সেখানে সর্বেসর্বা। এবার এই 'প্রজাতন্ত্রের প্রধান' বা 'রাষ্ট্রপ্রধান'-কে নির্বাচনের ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন জনগণের হাতে। যাতে তারা একটু হলেও সান্ত্বনা পায়, ধরে নেয় তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হচ্ছে, যিনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে। কিন্তু আসলেই কি তাই? নাকি ইরানের প্রেসিডেন্ট নিয়ে বোঝার আছে আরও অনেক কিছু?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনপ্রক্রিয়া

জনাব খোমেনী 'মাজলিসু সিয়ানাতিল দাসতুর' বা 'সংবিধান সংরক্ষণ পরিষদ', ভিন্ন অর্থে 'অভিভাবক পরিষদ'[৩] নামে একটি নতুন বোর্ড গঠন

---

১. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব আল-কুলাইনি কৃত *কাফি*; খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৭

২. President of the Republic (رئيس الجمهورية)

৩. Guardian Council (مجلس صيانة الدستور)

করেন। এ বোর্ডের প্রধান কাজ হলো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া। বারো সদস্যবিশিষ্ট এ বোর্ডের ছয়জনকে খোমেনী নিজে মনোনীত করেন। বাকিরা সংসদ সদস্যদের পরামর্শে বিচারব্যবস্থার প্রধান কর্তৃক নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য, বিচারব্যবস্থার প্রধানের নিয়োগ কিন্তু সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মর্জিমাফিকই হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, কথিত এই অভিভাবক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে হয়তো সর্বোচ্চ নেতা নিজে মনোনীত করবেন, কিংবা তার মর্জিমতে নির্বাচত হবে। এবার এই বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মাঝে যে কারও মনোনয়নপত্র বাতিল কিংবা কবুল করতে পারবে। সন্দেহ নেই, বোর্ড কেবলই ওই সকল প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রই গ্রহণ করবে, সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে যাদের রয়েছে দহরম-মহরম।

সুতরাং ফলাফল এই দাঁড়াল যে, শীর্ষ নেতার অপছন্দের কেউ প্রার্থীই হতে পারবে না, পদ পাওয়া তো বহুদূরের কথা। আর 'সংস্কারপন্থি' এবং 'সনাতনপন্থি' নামে যে দুটি দলের অস্তিত্বের কথা আমরা জানি, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে যে শীর্ষ নেতাকে চুপ থাকতে দেখি, এর সবই লোকদেখানো।

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি। দেখুন, সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোট ৪৭১ জন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেয়। কিন্তু অভিভাবক পরিষদ মাত্র চারজনের আবেদন গ্রহণ করে। যাদের দুইজন সনাতনপন্থি, দুইজন সংস্কারপন্থি। তবে সকলেই ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার অনুগত। উদাহরণস্বরূপ, আহমাদি নেজাদের সঙ্গে শীর্ষ নেতা আলী খামেনেয়ীর সম্পর্ক তো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি 'বিলায়াতুল ফাকীহ' চিন্তাধারার অন্ধভক্ত এবং সনাতনপন্থি রক্ষণশীল দলের সদস্য।

তার সঙ্গে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মীর হুসাইন মুসাভী। মুসাভী সংস্কারপন্থি দলের সদস্য। তার আরও একটি পরিচয় হলো, তিনি ইরানী বিপ্লবের একজন সক্রিয় সমর্থক। বিপ্লবের সময় তিনি প্যারিস থেকে

তেহরানে চলে আসেন। শুধু তা-ই নয়, খোমেনীর শাসনামলে ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, এ পদটি বিলুপ্ত হওয়ার আগে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী।

তৃতীয় প্রার্থী ছিলেন সংস্কারপন্থি দলের সদস্য জনাব মাহদী কাররুবী। তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইরানী পার্লামেন্টের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর চতুর্থ প্রার্থী ছিলেন জনাব মুহসিন রিজায়ী। সনাতনপন্থি রক্ষণশীল দলের সদস্য জনাব মুহসিন ইরান-ইরাক যুদ্ধে বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দায়িত্বরত ছিলেন।

নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মনোবাসনা পূরণকারী।

হ্যাঁ, কখনো কখনো এমনও ঘটে যে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান উল্লিখিত বিষয়গুলো বেমালুম ভুলে গিয়েছেন এবং এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যা শীর্ষ নেতার মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু এরপর কী ঘটতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

এ নিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়ার কিছু নেই; সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরতে পারে এমন বাস্তব ঘটনাই আছে। যেমন, আবুল হাসান বনীসদর। তিনি ছিলেন ইরানী বিপ্লব উত্তর প্রথম রাষ্ট্রপধান; ক্ষমতায় আসেন ১৯৮০ সালে খোমেনীর শাসনামলে। প্রথমে তিনি নিজেকে অন্যসব রাষ্ট্রপতির মতো যথেষ্ট স্বাধীন ও ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করেন। তিনি যেহেতু পঁচাত্তর শতাংশ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন—যাকে বলা যায় বিপুল ভোটে বিজয়ী—সুতরাং তার এ ভাবনা মোটেও অমূলক ছিল না।

কিন্তু কিছুকাল পরই নিজেকে তিনি নিছক 'কাঠের পুতুল' হিসেবে আবিষ্কার করেন। কারণ, রাষ্ট্রপতি হয়েও তার হাতে তার সরকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, ছিল না মন্ত্রিত্ব বন্টনে কোনো রকম পরামর্শ দেওয়ার অধিকার, খোমেনীর অনুমতি ছাড়া কিচ্ছুটি বলার অধিকার; সহজ কথায়, তিনি ছিলেন একটি 'রোবট', যার 'রিমোট' শীর্ষ নেতা খোমেনীর হাতে।

এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর একসময় তিনি আপত্তি তোলেন। কিন্তু ফলাফল দাঁড়াল এই যে, খোমেনী সাহেব আস্তে করে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং তার স্থলে অন্যজনকে বসালেন।

৭৫% ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে যদি শীর্ষ নেতার চোখের ইশারায় পদচ্যুত হতে হয়, তবে এত খরচ করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কী দরকার?! কী প্রয়োজন এত প্রচার-প্রচারণার?! কী প্রয়োজন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তোলার?

১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ইরানের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জনাব আলী খামেনেয়ী। তিনি একবার খোমেনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে 'শ্রম আইন'-সংশ্লিষ্ট একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এতে খোমেনী তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একটি চিঠি লিখেন। তাতে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'বিলায়াতুল ফাকীহ' মূলত 'বিলায়াতুর রাসূল' এর সমার্থক। কেননা তিনি আত্মগোপনে থাকা সেই নিষ্পাপ ইমামের পক্ষ থেকেই নির্বাচিত। একপর্যায়ে আলী খামেনেয়ী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। যদিও খোমেনীর মৃত্যুর পর তিনিই ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার পদ অলঙ্কৃত করেন। এবং এ পদের বলে তিনি নিষ্পাপ হয়ে যান, উঠে যান সকল সমালোচনার উর্ধ্বে।

সংস্কারপন্থি ও সনাতনপন্থি : মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

আমরা সংস্কারপন্থি রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ খাতেমিকে দেখেছি, তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। দীর্ঘ এ শাসনামলে নতুন কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। আচ্ছা, ক্ষমতার পালাবদলে ইরানে কি কোনো পরিবর্তন ঘটে? নাকি দিনশেষে ওই শীর্ষ নেতার ইশারাই যাবতীয় কলকাঠি নড়ে?

আমরা স্পষ্ট করেই বলতে চাই, একজন ইরানী নেতা, তিনি যে-পন্থিই হোন না-কেন, বস্তুত তিনি কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। আক্ষরিক অর্থে ইরানে কোনো রাজনৈতিক দলও নেই, নেই কোনো দলপতি।

আহমাদি নেজাদের কথাই ধরুন! নির্বাচনে তিনি কেবল নিজ ব্যক্তিসত্তার প্রতিনিধিত্বই করেন, কোনো দলের নয়। মীর হুসাইন মুসাভীর অবস্থাও একই। ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, আমেরিকার প্রসিডেন্ট নির্বাচনের মতোও নয়। যেমনটা আমরা দেখেছি, ওবামা ডেমোক্র্যাটদের প্রতিনিধিত্ব করেছে, আর জন ম্যাককেইন প্রতিনিধিত্ব করেছে রিপাবলিকানদের। সে তুলনায় ইরানের নির্বাচন নিতান্তই ফালতু। বস্তুত, এসব নাটকীয় নির্বাচনের কী মূল্য থাকতে পারে?!

এজন্য ইরানের রাজপথে যখন পদপ্রার্থীদের সমর্থকরা সংঘাতে লিপ্ত হয়, সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে তর্কযুদ্ধের অবতারণা হয়, তখন ধর্মীয় নেতারা সেসব দেখেও না দেখার ভান করেন, নীরবতা অবলম্বন করেন। তাদের এই নীরবতা কিন্তু অনিচ্ছাকৃত নয়।

এ বিষয়ে পরাজিত প্রার্থী মীর হুসাইন মুসাভী বলেন, 'অধিকার আদায়ের সকল পথ বন্ধ হয়ে আছে। অবশ্যই ইরানের জনগণ ধর্মীয় নেতাদের নীরবতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।' তিনি এই নীরবতাকে জালিয়াতির চেয়েও ভয়ংকর আখ্যায়িত করেন।

ধর্মীয় নেতারা জনগণের উত্তেজনা দেখেও নির্বাক থাকেন; ভাবখানা এমন, যেন অতিব গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদ ঘিরে এই উত্তেজনা। চুপ থেকে তারা বোঝাতে চান—দেশে গনতন্ত্র বিদ্যমান, আন্দোলনকারীরাও স্বাধীন এবং প্রার্থীরাও জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত হন। কিন্তু এসব লম্ফঝম্প দিনশেষে কেবলই নাটক, যাতে জনগণের পছন্দের অভিনেতারা শীর্ষ নেতার লেখা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অভিনয় করেন মাত্র।

এরপরও বিপদের কথা এই যে, সে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাই কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, আকীদাগত ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় জর্জরিত, অন্তর্ধানে থাকা কাল্পনিক ইমামের অনুগত; এমনকি স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবে থেকেও বলেন তার বিরোধিতা করা নাকি অবৈধ।

ইরানের প্রতি মুগ্ধতার কারণ

বাস্তবতা যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে কেন আমরা এই দুরবস্থার প্রতি মুগ্ধ হই? অনেক লেখক, এমনকি অনেক ইসলামী লেখকও কেন জোরগলায় ইরানের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা বলেন?!

আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যেসব কারণে মুসলমানরা ইরানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেগুলো হলো :

এক. ইরানের সংবিধান, শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও শীর্ষ নেতার মাঝে সম্পর্কের ধরন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা। তা ছাড়া, সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই আমরা বিবেকের ওপর আবেগকে প্রাধান্য দিই; নামমাত্র ইসলামের ঝান্ডা যে উঁচু করে ধরে, তার দিকেই ধাবিত হই; যদিও সে হয়ে থাকে ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট।

দুই. ইসলামের 'হাকিকত' আমাদের সামনে স্পষ্ট না থাকা। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, ইসলাম হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মতো মহান খলীফাদের ওপরও যৌক্তিক আপত্তি তোলার সুযোগ দিয়েছে। এমনকি, স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আমল ওহীনির্ভর নয়, তা নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনার অনুমতি দিয়েছে।

তিন. আমরা আসলে আরব দেশগুলোতে স্বৈরশাসন, প্রহসনের নির্বাচন এবং অরাজকতা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত। তাই বাহ্যত ভালোকিছু দেখতেই আমাদের ভালো লাগে, যদিও তার ভেতরটা হয় ভঙ্গুর। এজন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করে যখন কিছু একটা পেয়ে যাই, অমনি বলে ফেলি, 'আলহামদুলিল্লাহ, এই তো পাওয়া গেছে শুরা-ভিত্তিক "ইসলামিক স্টেইট", বাহ!'

চার. ইরাক, বাহরাইন, সৌদি আরব, সিরিয়া, মিশর, লেবাননের পরিস্থিতি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, সে বিষয়ে আমরা একেবারেই বে-খবর; এমনকি আমরা হয়তো এও জানি না যে, ইরানের সুন্নী মুসলিমদের ওপরও শীর্ষ ধর্মীয় নেতার ক্ষমতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে; তারা

একটু একটু করে 'বিলায়াতুল ফাকীহ' চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, এও ভাবতে শুরু করেছে যে, 'সুন্নীরা দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। কেননা, গায়েবী ইমাম তো শীর্ষ নেতাকে পরিস্থিতি অনুকূলে আনার দায়িত্ব দিয়েছেন মাত্র, যেন তিনি আগমনের সময় তাকে স্বাগত জানাতে পারেন।'

পাঁচ. আমেরিকা ও ইসরায়েলের জুলুম ও অত্যাচারে আমরা পিষ্ট। এজন্য কেউ তাদের বিরুদ্ধে বললে আমরা এতটাই উচ্ছ্বসিত হই যে, তার সম্পর্কে আর ঘাঁটাঘাঁটির প্রয়োজন মনে করি না; এমনকি, ইতিহাসের পাতায় একটু নজর বুলাতেও চাই না। অথচ একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা আসার সম্ভাবনা শূন্যের কোটায়।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের অবশ্যকর্তব্য হলো, মুসলিম উম্মাহকে সুস্থ চেতনা ও বিশুদ্ধ নীতির ওপর গড়ে তোলা; যা প্রাচ্য কিংবা পশ্চিমা মতাদর্শ অবলম্বনে সম্ভব নয়; শিয়া কিংবা খারেজি মতবাদের দিকে গেলে তো আরও অসম্ভব। আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে, শেকড়ের সন্ধান করতে হবে। যাবতীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথনির্দেশনা সামনে রাখতে হবে, ইতিহাসের পাতায় অমর সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের চেয়ে উত্তম আর কারা হতে পারে?! ভ্রষ্টদের প্রতি ভক্তি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয় কি?

নিয়ন্ত্রণাধীন শায়তান

আরব কিংবা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নজর দিলেই আমরা দেখতে পাই, ইরান-আমেরিকা উত্তেজনার খবরাখবর তারা খুব আয়োজন করে প্রকাশ করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে, এই বুঝি ইরানের ওপর আমেরিকার সামরিক হামলা শুরুই হয়ে গেল। কারণ, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে; আর জর্জ ডাব্লিউ বুশের মতে এটি একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, যার মাশুল 'বিপথগামী ইরান'-কে দিতেই হবে।

অনেকেই বলাবলি করেন, আমেরিকা কি সত্যিই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে? ইরাক অভিযানে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে কি এখন ইরানের পরমাণু প্রকল্পে বাধা দিতে যাবে? বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার কল্যাণে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া কি আবশ্যক?

এসব নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের মনে অগণিত প্রশ্নোত্তর, যা তাদেরকে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু করে রেখেছে। আমার মনে হয়, আমেরিকা কখনই ইরানের ওপর হামলা করবে না; এর কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেন নেই? চলুন কয়েকটি কারণ জানা যাক।

প্রথমত : আমেরিকা মোটেও এতটা নির্বোধ নয় যে, পা-য়ে পাড়া দিয়ে ইরানের সাথে যুদ্ধ বাধাবে। এ কথা সকলেরই জানা, মার্কিন সেনারা ইরাকেই মারাত্মক সঙ্কটের ভেতর দিয়ে গেছে; সেখানে তারা কল্পনাতীত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে; এমনকি যুদ্ধ শেষে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত মনে করতে হয়েছে। এসব কারণে অসংখ্য মার্কিন নাগরিক ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিও জানিয়েছে। সর্বশেষ, আমেরিকার দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, অর্থাৎ ওবামা এবং জন সিডনি

ম্যাককেইন তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ইরাক-সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : আমেরিকা খুব ভালোভাবেই জানে, ইরানে হামলার ফলে শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে অন্তত রাজনৈতিকভাবে ঐক্য তৈরি হবে। তখন তারা উভয়ে মিলে আমেরিকার পেছনে উঠেপড়ে লাগবে। এতে করে ইরাকী সুন্নীদের বিরুদ্ধে শিয়াদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবে, যা আমেরিকার জন্য সুখকর হবে না। কারণ, ইরাক অভিযানে তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল সুন্নী দমন। তা ছাড়া, ইরানে হামলা হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা ইরাকী শিয়াদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে। ফলে সুন্নীরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে; যা অচিরেই আমেরিকার জন্য মাথাব্যথার কারণ হবে।

তৃতীয়ত : ১৯৮০ সালের কথা। আমেরিকার একমাত্র ইরান অভিযানের অভিজ্ঞতা। উদ্দেশ্য ছিল ইরানী বিপ্লবের সেনাদের হাতে আটককৃত মার্কিন কূটনীতিকদের মুক্ত করা। এই সুবাদে আমেরিকা এক তিক্ত বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল। হামলা করতে এসে খোয়াতে হয়েছিল একাধিক যুদ্ধবিমান, নিহত হয়েছিল অনেক মার্কিন সেনা, ক্ষুণ্ন হয়েছিল তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা। আসলে ইরানের মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা আমেরিকার জন্য মোটেও সহজ কিছু ছিল না।

চতুর্থত : পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আর আমেরিকা খুব ভালোভাবেই জানে, ইরাকের মতো ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প মোটেও কাল্পনিক নয়। সুতরাং এই দেশে হামলার মানেই হলো আমেরিকার আয়ত্তাধীন কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পারমাণবিক বোমাহামলার ঝুঁকি গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড়ো মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে কাতারে; ওদিকে ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদীরাও ইরান থেকে অদূরে; আর ইরাক-কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের বিপুল উপস্থিতির কথা তো বলাই বাহুল্য।

পঞ্চমত : দূর কিংবা অদূর অতীতের ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা উল্লেখিত হয়নি যাতে কোনো শিয়া রাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। শিয়া রাষ্ট্রগুলো স্বভাবত কোনো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চোখও রাঙায় না। তবে হ্যাঁ, কেউ যখন তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের হুঙ্কার দেখে কে! বলতে দ্বিধা নেই, পাশ্ববর্তী সুন্নী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্যয়ের জন্যই মূলত শিয়া রাষ্ট্রগুলো শক্তি সঞ্চয় করে রাখে।

বুওয়াইহিয়া শিয়া সাম্রাজ্যের কথা মনে আছে? খ্রিষ্টীয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল তাদের একেবারে নিকটে। এরপরও কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো রকম সংঘর্ষ হয়নি। অপরদিকে আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে তারা ঠিকই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

একই আচরণ করেছে উবাইদিয়া শিয়া সাম্রাজ্য। উত্তর স্পেনে অবস্থাকারী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তো কিছু বলেইনি, বরং দক্ষিণ স্পেনের সুন্নী শাসক আবদুর রহমান আন-নাসিরের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেছে।

ক্রুসেডাররা যখন শাম ও ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালিয়েছিল, এই মিশরে থাকা উবাইদিয়া শিয়ারা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বরং বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্নী সেলজুক শাসকদের বিপক্ষে খ্রিষ্টানদের সাহায্য করেছে। এমনকি সুন্নীদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলো ভাগ-বণ্টনের রূপরেখা তারাই তৈরি করেছে।

সাফাভিদ শিয়া সাম্রাজ্য খ্রিষ্টান দেশ ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলেও সুন্নী উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঠিকই যুদ্ধ করেছে।

শিয়া রাষ্ট্র ইরান ধর্মত্যাগী রাশিয়ার ব্যাপারে বরাবরই নিশ্চুপ থেকেছে; অপরদিকে আফগান মুজাহিদদের ঠিকই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমেরিকা বা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে না জড়ালেও ইরাকের সঙ্গে ঠিকই আট-আটটি বছর যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

এসব ইতিহাস সামনে রেখে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, ইরান কোনো অবস্থায়ই আমেরিকা কিংবা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না, যদি না তারা হামলার শিকার হয়। তাদের ওপর সামান্য আঘাত এলেও তারা তার সমুচিত জবাব দেবে। ঠিক যেমনটি আমরা দেখেছি দক্ষিণ লেবাননে হিযবুল্লাহর আচরণ ও উচ্চারণে।

ষষ্ঠত : কয়েক মাস যাবৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইরানের রাষ্ট্রপতি আহমাদি নেজাদ যখনই ইরাক সফরে যান, আমেরিকা তাকে নিরাপত্তার চাদরে জড়িয়ে রাখে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, ইরান-আমেরিকা দ্বন্দ্বের কথা মিডিয়া যেভাবে প্রচার করে, বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। যদি ভিন্ন কিছু হয়েই থাকে, তাহলে ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে এই যে চিল্লা-পাল্লা, হুমকি-ধামকি এসব অনর্থক নয় কি?

পরিশেষে সম্ভাব্য যে দিকটি থাকে তা হলো, আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে ইরানে থাকা এমন এক 'জুজু'-র সংবাদ পেশ করতে চায়, যা শুনে আশপাশের রাষ্ট্রগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের কাছে ইরাক ও উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি যৌক্তিক মনে হয়।

অর্থাৎ, ইরান অচিরেই তেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, যেমনটি ইতঃপূর্বে হয়েছিল সাদ্দাম হুসাইন। সাদ্দাম পূর্ণ তেরো বছর ইরাক শাসন করেছেন। দীর্ঘ এ সময়ে আমেরিকা তার কোনো রকম বিরোধিতা করেনি। কিন্তু হঠাৎ তারা এমন উদ্ভট পরিস্থিতি তৈরি করল যে, অনেকেই সাদ্দাম হুসাইনের হাত থেকে ইসলামী দেশগুলো হেফাজতের জন্য আমেরিকার মতো ত্রাণকর্তার উপস্থিতি খুশি মনে মনে নিল।

এরপর যখন সাদ্দাম হুসাইন অধ্যায়ের অবসান ঘটল, ক্ষমতাসীনদের কাতারে তিনি আর উল্লেখযোগ্য কেউ রইলেন না, তখন সকল রহস্য উন্মোচিত হলো; জানা গেল, ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরির অপবাদ এবং তার ওপর ভিত্তি করে ইরাকে চালানো মার্কিন সেনাদের আগ্রাসন সবই ছিল আমেরিকার সাজানো নাটক। ইরাকে আদৌও কোনো বিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কিন্তু মানুষ বরাবরই খুব দ্রুত সব ভুলে যায়। এবারও তাই হলো। এই সুবাদে আমেরিকা এখন আবার নতুন জুজুর সন্ধানে নেমেছে। তবে এবারের জুজু তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা নেই, কিংবা নেই কোনো সংঘাত ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার জন্য ইরানের চেয়ে উত্তম বিকল্প আর হতেই পারে না। এজন্য বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে তারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিতভাবে 'মিডিয়া সন্ত্রাস' চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, ইরানের পালাও বছর কয়েক পরে শেষ হয়ে যাবে। তখন আমেরিকা আবার নতুন কোনো জুজুর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে। নির্বোধ ও নির্লজ্জের মতো এই খেলা তারা চালিয়েই যাবে, যতদিন না মুসলমান নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং এই অঞ্চলের সকল জুজুকে উচিত শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়—হোক সেটা মার্কিন, ইরানী কিংবা ইহুদী।

শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

মুসলিম উম্মাহকে দ্বিধায় ফেলতে সংবাদসংস্থাগুলো বিভিন্ন রকম তথ্য প্রচার করে। তারা বলে বেড়ায়, শিয়া-সুন্নী সকলেই তো মুসলমান, তাই শিয়াদের দোষারোপ করা আরেক অর্থে মুসলিম উম্মাহরই ক্ষতি। আর এ বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা মুসলিম জাতির মাঝে বিভক্তি তৈরি করবে বৈকি। তাদের এই বক্তব্য দুটি কারণে সঠিক নয়।

প্রথমত : সারা বিশ্বে মুসলমানদের তুলনায় শিয়াদের সংখ্যা মাত্র এগারো শতাংশ। সুতরাং অবশ্যই এটি বে-ইনসাফির কথা যে, কিছুসংখ্যক শিয়া রক্ষার্থে মুসলিম জাতিকে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে; অপরদিকে তাদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা, উত্তম আখলাক, সঠিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনীতির শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই বলা হবে না।

দ্বিতীয়ত : আমরা ইতঃপূর্বে 'শিয়াদের নিয়ে শঙ্কা' শিরোনামের অধীনে বলে এসেছি, বিষয়টি মোটেও এমন নয় যে, পরিস্থিতি খুবই শান্ত আর আমরা আগে বেড়ে উত্তপ্ত করতে চাচ্ছি; বরং বাস্তবতা হলো, ইতোমধ্যে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাংশ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে; এবং অনেক ইসলামী রাষ্ট্রকেই তা জ্বালিয়ে দিতে শুরু করেছে; যারা অগ্রভাগে রয়েছে ইরাক।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়? আমরা কি কেবল চেয়ে চেয়ে দেখব, আর ওদিকে সুন্নী মুসলিমের রক্তের নদী বয়ে যাবে? এত সহজে বৃহত্তর একটি রাষ্ট্রের ভাগ্যে এভাবে দুর্গতি নেমে আসেবে? আমরা কেবল চোখ মেলে তাকিয়ে আছি, আর ওদিকে ইরান দূর বা কাছের রাষ্ট্রগুলোর জন্য হুমকি হয়ে বেড়ে উঠছে, আমাদের কি কিছুই করার নেই?

তাই এ পর্যায়ে আমরা সমস্যার একেবারে মূলে পৌঁছতে চেষ্টা করব। তাতে আশা করি কিছু যৌক্তিক সমাধান বের হয়ে আসবে। আসলে সমস্যার উৎস, মূল, ধরন, গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি না-ই জানা যায়, তবে সঠিক সমাধান বের করা কীভাবেই-বা সম্ভব?!

আধুনিক শিয়া গোষ্ঠী মুসলিম উম্মাহর জন্য কতটা খতরনাক, তার কিছুটা আমি 'শিয়া নিয়ে শঙ্কা' আলোচনায় উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমি গুরুত্বপূর্ণ এমন পাঁচটি দিক নিয়ে কথা বলেছি, যার একটি বিবেচনায় রাখলেই শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের মজবুত পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। পাঠকের সুবিধার্থে সেই পাঁচটি বিষয় সংক্ষেপে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি :

এক. সাহাবীদের প্রতি বিরামহীন বিষোদগার। এত গুরুত্ব দিয়ে এ নিকৃষ্ট কাজটি তারা করে, যেন এটিই তাদের কাছে ধর্মের খুঁটি। সন্দেহ নেই, সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ জঘন্যতম অন্যায়, অপরাধের চূড়ান্ত সীমার লঙ্ঘন। আমাদের ওয়েবসাইটে[1] সাহাবায়ে কেরাম প্রসঙ্গে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নিচে অবিরত শিয়াদের জঘন্য সব মন্তব্য আসতে থাকে। বিশেষত হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রসঙ্গ এলে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সাহাবীদের নামই যেন তাদের চক্ষুশূল। তাঁদের নামগুলো দেখলেই তারা উত্তেজিত হয়। এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ আর বিষোদগার কত সহ্য করা যায়? আমরা আগেও বলে এসেছি, এমন নোংরামো দেখেও না দেখার ভান করা দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নামান্তর—যা কোনোভাবেই আমাদের জন্য বৈধ নয়।

দুই. ইসলামী বিশ্বে শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা—হোক সেটা শিয়া মতবাদের নামে, কিংবা ভিন্ন কোনো মোড়কে।

---

1. www.islamstory.com

তিন. ইরাকে হাজারও সুন্নী মুসলিমকে বিনা অপরাধে হত্যা করে ফেলা।

চার. ইরাকের ওপর সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালানোর সরাসরি হুমকি প্রদান এবং এসব করে আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণ।

পাঁচ. ইরাক ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রকে হুমকি প্রদান। শিয়াদের পক্ষ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং সৌদি আরবকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। আমার জানা নেই, এসব দেশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এমন নীরব থাকাই কি আমাদের জন্য কল্যাণকর, নাকি নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

উল্লিখিত এ পাঁচটি বিষয় আমরা 'শিয়াদের নিয়ে শঙ্কা' প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। যেহেতু আলোচনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তাই সেটি না পড়ে থাকলে গুরুত্ব সহকারে পড়ে নেওয়ার আহ্বান থাকবে। আর এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে 'শিয়াদের গোড়ার কথা' এবং 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার' শিরোনামে প্রবন্ধ-দুটিও পড়ে নেওয়ার অনুরোধ থাকছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়টি কি এখানেই সমাপ্ত? দুঃখজনক হলেও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে, 'না'।

বস্তুত, শিয়ারা এরচেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ংকর। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, পরিস্থিতির অবক্ষয় কখনো কখনো কল্পনার চেয়েও অধিক হয়। উদাহরণত, উবাইদিয়া ইসমাঈলিয়া শিয়ারা মিশরে আগ্রাসন চালিয়ে টানা দুইশ বছর ক্ষমতায় ছিল। এ সময় মিশরের যে পরিস্থিতি তারা করেছিল, অধিকাংশ 'দুঃখবাদী' মানুষও তা কল্পনায় আনতে পারবে না। কিন্তু ঘটছে তো তা-ই, যা আমরা জেনেছি। এ থেকেই আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক হওয়া জরুরি, খুবই জরুরি।

আধুনিক শিয়াদের মুখোশ পুরোপুরি উন্মোচন করতে আরও কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি; আশা করছি এতে সকলের বুঝে আসবে শিয়া সম্প্রদায় কতটা ভয়ংকর, কতটা খতরনাক।

ছয়. ইদানীং ইরান-সিরিয়া মৈত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রূপ আমাদের চোখে পড়ছে। এতে নানামুখী আশঙ্কা রয়েছে। অন্যতম হলো, সিরিয়ায় শিয়া মতাদর্শের বিস্ফোরণ। হ্যাঁ, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সিরিয়ার শাসনক্ষমতা নুসায়েরী বা আলাওয়ী সম্প্রদায়ের হাতে। তাদের টার্গেট হলো, সিরিয়ায় আবু শুয়াইব মুহাম্মদ ইবনু নুসাইর আল-বাসরীর (মৃত্যু ২৭০ হিজরী) মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। ইবনু নুসাইর একসময় নিজে নবুওয়তের দাবি করেছিল এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুই খোদা! মায়াযাল্লাহ।

নুসায়েরী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ। এরপরও রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা তারাই কুক্ষিগত করে রেখেছে। তারা সেখানে শিয়া মতাদর্শ বিস্তারের সকল ব্যবস্থাপনা করে রেখেছে। এই সুবাদে শিয়া মতাদর্শ ইরান থেকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ইরাক, সিরিয়া এবং লেবাননে। নিঃসন্দেহে এ কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিশাল এক ফাটল তৈরি হবে; এত বড়ো বিভেদ জন্ম নেবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না।

সাত. আরও একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে রয়েছে; কোনো রকম কালবিলম্ব না করে সেটি নিয়ে আমাদের এখনই ভাবা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি হলো, শিয়া নেতাদের প্রতি সুন্নী মুসলিমদের আসক্তি; বিশেষত, লেবাননের হিযবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ এবং ইরানের রাষ্ট্রপতি আহমাদি নেজাদ।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এ দুজন নেতার ব্যক্তিত্ব সুন্নী সাধারণ মুসলিমদের জন্য বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, বর্তমান বিশ্বে সুন্নী রাষ্ট্রপ্রধানদের মাঝে একজন যোগ্য মুসলিম নেতার অনুপস্থিতিই এই সুযোগ করে দিয়েছে। আর ফিতনার মূল উদ্দীপক

হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লিখিত নেতার সফলতা। যেমন, ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিযবুল্লাহর আপেক্ষিক বিজয় এবং ইরানী বিপ্লবে আহমাদ নেজাদিদের সফলতা।

এ ক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যিক করণীয় হলো, মুসলিম উম্মাহর সামনে এ বিষয়টি তুলে ধরা যে, ক্ষেত্রবিশেষ সফলতা অর্জন ব্যক্তির আকীদা ও মানহাজের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে না। সুতরাং কেউ কোনো বিষয়ে সফলতা অর্জন করে ফেললেই তার প্রতি এতটা মুগ্ধ হওয়া যাবে না; তাতে, বিষয়টি যত বড়োই হোক না কেন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, নিকৃষ্ট উবাইদিয়া সম্প্রদায় রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন বিশাল বিজয় অর্জন করেছিল, যা ইরান ও হিযবুল্লাহর তুলনায় দশ গুণ নয়, একশ গুণ বড়ো; তাই বলে কি আমরা তাদের আদর্শ গ্রহণ করতে পারব? আমরা তো বরং সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও একজন সেক্যুলার নেতার আদর্শই গ্রহণ করতে পারি না। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, একজন আদর্শ মুসলিম নেতা অবশ্যই বিশুদ্ধ আকীদা, উত্তম আখলাক, সুন্দর আমল ও সঠিক জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবেন; তার সকল প্রচেষ্টা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য; তিনি আল্লাহর মনোনীত ধর্মের সাহায্যার্থে হবেন নিবেদিতপ্রাণ এবং সকল বিকৃতি ব্যতিরেকে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় থাকবেন সদাসচেষ্ট।

আচ্ছা, মধ্যপন্থি শিয়া নেতাদের নেতৃত্ব যারা মেনে নিতে চায়, তাদের যদি আমি এই প্রশ্ন করি যে, ইসনা আশারিয়াদের বারো ইমাম সম্পর্কিত আকীদা কি আপনারা গ্রহণ করে নেবেন? আপনারা কি কোনো অবস্থায়ই সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস, ফিকহী মাযহাব এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থগুলো পরিত্যাগ করতে পারবেন? শিয়া নেতাদের অধীনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি আমাদের কারিকুলামে থাকবে, নাকি শিয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে? তাদের উত্তর তখন কী হবে?

ইতঃপূর্বে ইরানে ইসমাইল আস-সাফাভী শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল; যা শাসনব্যবস্থা ও নিয়মশৃঙ্খলার দিক থেকে ছিল অতুলনীয়। কিন্তু তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পর তারা কী আচরণ

করেছিল, তা নিশ্চয়ই আপনারও মনে আছে। 'শিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি; প্রয়োজনে আবারও দেখে নেওয়া যেতে পারে। আমরা সেখানে তুলে ধরেছি, কীভাবে তারা উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করেছে; কীভাবে ইরাকে শিয়া মতাদর্শের বিস্তার ঘটিয়েছে; কীভাবে উসমানী সুন্নীদের বিপক্ষে পর্তুগিজদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যার সবটুকুই আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয়। এ ধর্মের কিছু অংশ গ্রহণ এবং বাকিটা বর্জন কারও জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

> হে ওই সকল লোকেরা, যারা ঈমান আনয়ন করেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।[১]

সুতরাং কাউকে নেতা মানতে চাইলে অবশ্যই তাকে সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে হবে। যদি কোনো দিক থেকে কিছুটা অপূর্ণতা থেকেও থাকে, তবে অবশ্যই তা আকীদাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারবে না। আর নয়তো আমাদেরকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে।

আট. অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে শিয়াদের পক্ষের অসংখ্য 'বর্ণনা' ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা যদি এ সকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে চাই, তাহলে অবশ্যই এগুলোকে যাবতীয় ভুল ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে। নিঃসন্দেহে এ কাজটি অতীব জরুরি, যারপরনাই দরকারি।

এ কাজটির বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে ইলমের বিশাল এক ভান্ডার হয়তো আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ও প্রজন্মের মানুষদের নিয়ে আমাদের মনে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় জাগতে থাকবে।

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮

এজন্য প্রথমে আমাদেরকে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে থাকা শিয়াদের পক্ষের অশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে হবে। এরপর সেসব অশুদ্ধ বর্ণনা থেকে গ্রন্থগুলো পরিশুদ্ধ করতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে বের করে আনতে হবে সঠিক পাঠ ও শিক্ষা।

এ বিষয়ে আমার একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আছে। আমি একবার '*তারিখুত তাবারী*' থেকে সিফফিনের ঘটনা-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো গণনা করি। সব মিলিয়ে ১১৩টির মতো হয়। এরপর যখন দেখি এর মধ্যে ৯৯টি বর্ণনাই শিয়াদের পক্ষের, যাতে কেবল সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয়েছে, আমি সত্যিই হতভম্ব হয়ে যাই। শিয়ারা সাহাবীদের চরিত্র হননের জন্য এ বর্ণনাগুলোই ঘুরেফিরে আলোচনায় আনে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কথিত কিছু সুন্নী সংবাদকর্মী, যারা ধর্মীয় জ্ঞানের আলোকে নিতান্তই মূর্খ, উপরন্তু শিয়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত।

এদের জোর কেবল এই যে, বর্ণনাগুলো '*তারিখুত তাবারী*'তে আছে; আর ইমাম তাবারী তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর শীর্ষস্থানীয় ইমাম। কিন্তু এরা কখনই ইমাম তাবারী কর্তৃক উল্লেখিত 'সনদগুলো' চেয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করে না। কখনো যদি দেখেও ফেলে, তাদের সংকীর্ণ জ্ঞানে সনদে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে ভালোমন্দ কিছুই ধরা পড়ে না। তাই শিয়াদের পক্ষের সকল অশুদ্ধ বর্ণনা থেকে ইতিহাসগ্রন্থগুলো মুক্ত করতে হবে।[১] যাতে করে মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারে।

নয়. অনেক মুসলমানই এমন আছেন যারা শিয়াদের ব্যাপারে নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত মনে করেন। আচ্ছা, এটা কি কোনোভাবেই বিচক্ষণতার পরিচয় হতে পারে যে, ১৫০ মিলিয়ন মুসলমান আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে নেবে আর আমরা তাদেরকে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রষ্ট আমলের ব্যাপারে একটুও সতর্ক করব না?!

---

১. উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো না সরিয়ে বরং প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করাই ভালো মনে করেন। কারণ, এতে পাঠকের সামনে মূল সমস্যাটি স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। —অনুবাদক

এই মানুষগুলোকে কি সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার প্রয়োজন নেই? 'শিয়াদের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে যে পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে, সে ব্যাপারে কি আল্লাহর সামনে আমাদের জিজ্ঞাসিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই?

আমার এই প্রবন্ধগুলোতে শিয়াদের অনেকেই মন্তব্য করেছে। মন্তব্যে তারা বলেছে যে, আল্লাহ যেন আমার হাশর শায়খদ্বয় তথা, হযরত আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে করেন। আমার কাছে সৌভাগ্যই মনে হয়েছে যে, তাদের কেউ আমাকে বিচার দিবসে ইসলামের প্রথম দুই খলীফার পাশে রাখার দোয়া করছে; অথচ তাদের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত ছিলাম এ কারণে যে, তারা নিজেদেরকে পাহাড় সমান ইলম ও আমলের অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিদের শত্রু বানিয়ে বসে আছে।

আমার মনে হয়, আলেম-ওলামা ও দাঈরা তাদের কাছে এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন; নিঃসন্দেহে তাদের মাঝেও এমন অনেক ইনসাফওয়ালা আছে, যাদের কাছে বিশুদ্ধ জ্ঞান পৌঁছামাত্রই তা গ্রহণ করে নেবে; সত্যকে তারা মেনে নেবেন—তাতে যত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হোক না কেন।

দশ. ইরানের অসহায় সুন্নীদের পক্ষে কথা বলার কেউ কি আছে? আপনার কি জানা আছে, ইরানী সুন্নীদের সংখ্যা কত? হয়তো জেনে অবাক হবেন, তাদের সংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। এরপরও ইরান সরকারে তাদের থেকে কোনো মন্ত্রী নেই; এমনকি সংসদ সদস্যও ১০ শতাংশের কম।

রাজধানী তেহরানে লাখও সুন্নী মুসলিম নিজেদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন; কিন্তু আজও পর্যন্ত তাদের সে চেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। এমনকি যারাই নাগরিক অধিকারের দাবি তুলেছে, তারাই দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে। তাদের এ দমন-পীড়ন

গিয়ে ঠেকেছে সুন্নীদের মসজিদ ভাঙা পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সালে খোরাসানে 'শায়খ ফয়জ মসজিদ' গুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। এরপর রয়েছে বেলুচিস্তানের জামে মসজিদ ভাঙার ঘটনা। এ ছাড়াও তারা মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে ফয়জ মসজিদে অবস্থান গ্রহণকারী একশর বেশি যুবককে হত্যা করেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে, ইরানের ২০ মিলিয়ন সুন্নীরা যে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করে, তা সুন্নী আকীদা বিরুদ্ধ এবং শিয়া আকীদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আরও পরিতাপের বিষয় হলো, সুন্নীদের বিরাট একটি অংশ ইরানে অবস্থান করছে, অথচ তাদের সুখ-দুঃখ দেখার পৃথিবীতে কেউ নেই।

আমরা কি কেবল ইরানী ও ইরাকী সুন্নীদের এই মানবেতর জীবনযাপন দেখেই যাব? নাকি কখনো কখনো একটু মুখও খুলব; যাতে আল্লাহ এমন কাউকে জাগ্রত করবেন, যার দ্বারা কিছু-না-কিছু হবে।

এই মোট দশটি বিষয় তুলে ধরলাম, যা আমার কাছে শিয়াদের ভয়াবহ দিক বলে মনে হয়েছে।

এরপরও কি মুসলিম ভাইদের কাছে চুপ থাকাই যৌক্তিক মনে হচ্ছে? এখনো কি বিশ্লেষকদের কাছে মনে হচ্ছে, যে ক্ষতি আমরা মুখ না খুলেই দেখতে পাচ্ছি এরচেয়েও বড়ো ক্ষতি হবে মুখ খুললে? যতগুলো ক্ষতিকর দিক আমরা পূর্বে ও এই প্রবন্ধ তুলে ধরলাম, এরপর আরও কি কিছু বাকি আছে?

বন্ধুগণ, আমাদের এই প্রবন্ধগুলোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলো পাঠ করে কেউ ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের শিয়াদের ওপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে দেবে। আমরা এও বলতে চাচ্ছি না যে, ইহুদীদের চেয়েও শিয়ারা আমাদের জন্য আশঙ্কাজনক। বরং এ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো সকলের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা; যাতে জ্ঞানীগুণীরা বাস্তবতা উপলব্ধিপূর্বক যথাযথ ও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

অসংখ্য মানুষ আছে এমন, যারা না জেনে, না বুঝে জটিল সব বিষয়ে নানা রকম মন্তব্য করে ফেলে। অথচ আবেগ ছাড়া তাদের আর কোনো পুঁজি নেই। তারা এমনভাবে বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় নেমে পড়েন, যেন তারটাই বাস্তব এবং অচিরের অন্যদেরকে সেটার মুখোমুখি হতে হবে।

এসব ভয়ংকর তথ্যাদি জানার পর শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হতে পারে? চলুন, তা নিয়ে কথা বলা যাক।

প্রথমত : আমাদের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, ইসনা আশারিয়া শিয়ারা যদিও ভ্রান্তি ও বিদআতে লিপ্ত, কিন্তু সাধারণভাবে তারা মুসলিমই। এ কারণে তাদের ব্যাপারে বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন, পানাহার, বিচার-আচার, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধানই প্রয়োগ করে থাকেন। একই কারণে তাদেরকে হজ ও উমরার সুযোগ দেন এবং অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ পবিত্র স্থানগুলোতে তাদেরকে প্রবেশাধিকার দেন।

কিন্তু এতে করে তাদের ওই মারাত্মক ভ্রান্তিগুলো দূর হয়ে যায় না, যা থেকে সংশোধন অপরিহার্য। বরং বিষয়গুলো শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এখানে সেসব তুলে ধরার সুযোগ নেই।

আলেমরা আরও মনে করেন যে, শিয়াদের কিছু দল আছে যাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা যায়। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ইসমাঈলিয়া, নুসাইরিয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : ভ্রান্ত ও বিকৃত মতাদর্শের ওপর শিয়াদের অবিচলতা থেকেই আমরা এ কথা বলে দিতে পারি যে, তাদের সাথে আমাদের আকীদাগত এবং ফিকহ-সংক্রান্ত সমন্বয় কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অনেকে যেমন শিয়া মতাদর্শকে ফিকহী মাযহাব মনে করে বিষয়টি আদৌ তেমন নয়।

মনে রাখতে হবে, শিয়া মতাদর্শ সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুত। তাই আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র হতে পারে না,

তেমনই সঠিক ও ভুল পথের মাঝে কোনো সমন্বয় হতে পারে না। ভুল, ভুলই—তা যত সামান্যই হোক না কেন। ইসলামী শরীয়তে এমন সমন্বয়ের কোনো সুযোগ নেই।

আচ্ছা, সমন্বয় যদি আমরা করতেও চাই, তাহলে সেটার রূপরেখা কেমন হবে? আমরা কি বলব যে, কিছু সাহাবীকে গালি দেওয়া বৈধ? ইমাম দ্বাদশের কতক ইমামের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব? বুখারী ও মুসলিমকে গ্রহণ করে তিরমিযি ও আবু দাউদকে ত্যাগ করা হবে? কিছু কিছু পরিস্থিতিতে 'নিকাহে মুত'আ' বৈধ? ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননে সুন্নীদের নিধন করা যাবে এবং অন্যত্র প্রতিরোধ করা হবে?

বন্ধুগণ, সমন্বয় আসলে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সমন্বয়ের সকল দরোজা বন্ধ।

শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে আকীদাগত ও ফিকহ-সংক্রান্ত সমন্বয়ের উদ্যোগ বস্তুত দীনকে বিকৃত করারই নামান্তর। এমন কিছু চিন্তা করা আমাদের জন্য মোটেও উচিত নয়। আমরা ওই সকল আলেমদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করতে পারি, যারা তাদের জীবনের বড়ো একটি অংশ এই কাজে ব্যয় করেছেন; কিন্তু পরিশেষে তাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল উদ্যোগ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা সিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম ডা. মুস্তফা সিবাঈ রহিমাহুল্লাহর কথা উল্লেখ করতে পারি। এ বিষয়ের সকল প্রচেষ্টার ব্যর্থতা নিয়ে তিনি তার এক গ্রন্থে লিখেন, 'সমন্বয়ের এই আহ্বান হলো আহলুস সুন্নাহকে শিয়া মতাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার আহ্বান।'[১]

একই পথে হেঁটেছেন আল্লামা ইউসুফ কারযাবী এবং তিনিও পরিশেষে একই ফলাফল পেয়েছেন।

তৃতীয়ত : শিয়াদের আকীদা ও মানহাজের বিরুদ্ধাচরণ করেই কেবল আমাদের থেমে থাকা যাবে না, বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদায় বিশ্বাসীদেরকে উপকারী ইলম শিক্ষা দিয়ে ওসব ভ্রান্ত

---

১. *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*; পৃষ্ঠা : ২৪

আকীদায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে হেফাজতে রাখতে হবে। আলেম-ওলামা ও দাঈদের করণীয় হবে, আহলুস সুন্নাহর সামনে তাদের দীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং তাঁর সাহাবিদের ঘটনাবলি সঠিকভাবে তুলে ধরা। আর আমাদের সকলের কর্তব্য হলো, ইতিহাসের বিশাল ভান্ডার থেকে উপকৃত হতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হওয়া। খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, যে জাতি গুরুত্বের সাথে তার ইতিহাস অধ্যয়ন করে না, সে জাতির কখনো নিজের ভবিষ্যৎ নিরূপণের সমর্থ হয় না।

চতুর্থত : শিয়ারা বিশ্বজুড়ে যে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করে রেখেছে, এসব নস্যাৎ করতে গিয়ে আমাদের লজ্জিত কিংবা ভীত হলে চলবে না; কিংবা এই ভেবে মুখ লুকোনো যাবে না যে, শিয়াদের মুখোশ উন্মোচন করতে গেলে আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে যাব; বরং সাহসের সাথে কথা বলে যেতে হবে। কারণ, প্রসঙ্গটি আকীদার; বিষয়টি ভুল সংশোধনের, সঠিক পথের সন্ধানের।

এ ছাড়া শিয়ারা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে যে ঝামেলা বাধিয়ে রেখেছে, সেগুলো দূর করতে হবে; প্রতিটি বিষয় ইসলামের বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে হবে, আহলে বাইতের প্রতি আহলুস সুন্নাহর ভক্তি, শ্রদ্ধা কত বেশি। সেই সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করতে হবে যে, আহলে বাইতের প্রতি শিয়াদের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির বৈধতা ইসলামী শরীয়তে নেই। যদি তা-ই হতো, তাহলে আহলে বাইত কি কোনোভাবেই নবীজির আনীত দীনের কোনো রকম ক্ষতি চেয়ে চেয়ে দেখতেন?!

পঞ্চমত : আমাদের অন্যতম একটি কর্তব্য হলো শিয়াদের উদ্দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; তারা যেন তাদের ইতিহাস ও আকীদাগত বিষয়গুলো বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়নের দিকে অগ্রসর হয়, সেই আহ্বান করা। আশা করা যায়, এতে তারা বুঝতে সক্ষম হবে তাদের পক্ষের বর্ণনাগুলো খুবই দুর্বল কিংবা অসম্পূর্ণ সনদে বর্ণিত; তাদের মানহাজ ও মতাদর্শের

অনেক কিছুই আছে এমন, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর আগে যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মাঝে যারা মুখলিস, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করবেন। তাঁর জন্য এটি খুবই সহজ।

ষষ্ঠত : আরব ইসলামী দেশসমূহে বিশেষত, পশ্চিমা দেশগুলোতে অবস্থানরত মুসলিমদের কর্তব্য হলো, ঝড়ের বেগে যে শিয়া মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে, সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা। আমরা বারবার বলেছি, শিয়া মতাদর্শ মানেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত বাহরাইন, আমিরাত, সৌদি আরব এবং জর্ডানের মুসলমানদের মনে রাখতে হবে, তাদের দেশে শিয়া মতাদর্শ জলোচ্ছ্বাসের মতো আঘাত হানতে যাচ্ছে।

সপ্তমত : ইরাক, ইরান ও লেবাননের মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো, সকলে মিলে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা, সকল পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা; সেই সাথে ইসলামী বিশ্বের সুন্নী মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; কাঁধে কাঁধ রেখে, হাতে হাত রেখে সকল বিপদ-আপদ মোকাবিলা করা; বিশেষত, নিজেদের সংবাদসংস্থা গঠন করা, যাতে করে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায় এবং বিপদের সময় সকলের সাহায্য পাওয়া যায়।

অষ্টমত : শিয়া-সুন্নী পরস্পর সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত না হয়ে এবং চেতনাগত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়াবলি এড়িয়ে গিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমস্যার কিছু নেই। তবে শর্ত থাকে যে, এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত থাকতে হবে। একদিকে ইরাকী শিয়াদের অধিকার সংরক্ষণ করা হবে, অপরদিকে ইরাকে কিংবা ইরানে সুন্নীদের অধিকার লঙ্ঘন করা হবে, তা তো মনে নেওয়া যায় না।

নবমত : বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে শিয়া-সুন্নী রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি হলে হতেও পারে; তবে সেটা হবে খুবই সতর্কতার সাথে। কারণ

এ সকল ঐক্যে যে-কোনো সময় ফাটল ধরতে পারে। তা ছাড়া ইতিহাস সাক্ষী, দিনশেষে অনৈক্যই এসব ঐক্যের শেষ পরিণতি।

এজন্য খেয়াল রাখতে হবে, এই ঐক্য টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যেন আকীদাগত কিংবা শরীয়ত-সংক্রান্ত কোনো বিচ্যুতি না ঘটে। আর এসব ঐক্য যেন অবশ্যই বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কোনো কল্যাণের নিমিত্তে সংগঠিত হয়। এমনি এমনিই এসবের দিকে আগানো যাবে না; তাতে নিজেদের মাঝে জটিলতা বাড়বে, অস্থিরতা তৈরি হবে।

দশমত : মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে, তারা যেন তাদের কাঁধে অর্পিত মহান জিম্মাদারি পালনের ব্যাপারে সচেষ্ট হন। আর মুসলিম উম্মাহ এখনো এতটা অসহায় হয়ে পড়েনি যে, কারও সঙ্গে তাদের সমঝোতায় যেতে হবে। শিয়াদের প্রতি তাদের যতটুকু ভালোলাগা তৈরি হয়েছে এজন্য যোগ্য মুসলিম শাসকের অনুপস্থিতিকেই দায়ী করা যায়।

কেননা আমরা দেখেছি, ইসরায়েল ও ডেনমার্কের ব্যাপারে তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান রজব তৈয়ব এরদোগানের অবস্থান মুসলিম উম্মাহ উচ্ছ্বাসভরে সমর্থন করেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম উম্মাহ এমন একজন সুন্নী নেতার অপেক্ষায় আছে, যার পতাকাতলে তারা দলে দলে সমবেত হবে। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আপনাদের সামনে হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে তুলে ধরেন; আপনাদেরকে হকের অনুসারী এবং বাতিলের প্রতিরোধকারী হিসেবে কবুল করেন।

আপনাদের সামনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ দশটি দিক তুল ধরলাম। আশা করি, এ দশটিই যথেষ্ট মনে হবে।

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এমন আরও কয়েক দশক, কয়েক শতক বরং কয়েক হাজার প্রশ্ন রয়ে গেছে, সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থে যেদিকে ইঙ্গিত করার সুযোগও হয়নি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করা, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা। বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সুদীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার পথ পাড়ি দিতে হবে।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের আলেমদের এই মহান কাজ আঞ্জাম দেওয়ার এবং মানবজাতির সমানে অস্পষ্ট সব বিষয় স্পষ্ট করার তাওফিক দান করেন; যাতে করে দুনিয়া থেকে যাবতীয় ফিতনা দূরীভূত হয়ে যায়, দীনের সকল বিধান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে পালিত হয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন, তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম প্রদর্শন করুন, আগে পরে সর্বাবস্থায় কল্যাণ দান করুন।

হে আল্লাহ, আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিশালী করুন, সম্মানিত করুন।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠক, বইটি পাঠ করে শিয়া নিয়ে আপনার মনে থাকা যাবতীয় সংশয় কি কাটল? এ বিষয়ে জাগা সকল প্রশ্নের তৃপ্তিকর উত্তর কি পাওয়া গেল? আমার তো মনে হয়, তা সম্ভব হয়নি; আসলে হবার কথাও নয়।

সন্দেহের অবকাশ নেই, বিষয়টি খুবই জটিল, অত্যন্ত কঠিন। এ কারণে এ বিষয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী ও বোদ্ধা লেখকদের বইপত্র পড়েও পাঠকদের সংশয় কাটে না, মনের কোণে ঘুরপাক খায় প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন।

তাহলে উপায় কী এখন?

আশা করি এ বিষয়ে *কিসসাতুশ শিয়া* নামক আমার প্রকাশিতব্য গ্রন্থটি আপনার খুবই কাজে আসবে, যা আমি ভূমিকায়ও বলে এসেছি। ইনশা-আল্লাহ, সে গ্রন্থে ছোটো-বড়ো সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে; কারও মনে আর কোনো সংশয় যেন বাকি থাকে, সেই চেষ্টা করা হবে।

সম্মানিত পাঠক, প্রকাশিতব্য সে গ্রন্থ রচনায় আপনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তা খুবই চমৎকারভাবে। হ্যাঁ, শিয়া নিয়ে আপনার মনে থাকা যে প্রশ্নগুলোর উত্তর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাননি, তা নিঃসংকোচে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের কাছে। বলতে দ্বিধা নেই, আপনার মূল্যবান প্রশ্নগুলো আমাদের প্রকাশিতব্য গ্রন্থকে সন্দেহাতীতভাবে সমৃদ্ধ করবে; যা পরবর্তী সময়ে আপনাদের জন্যও সুখকর হবে, ইনশাআল্লাহ।

পাঠক, এ ব্যাপারে আমাদের ওয়েবসাইটে[1] যোগাযোগ করার জন্য বিনীত আহ্বান থাকছে। আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিক।

নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর এক চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সেটাই, যে পথে চলে এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম সফল হয়েছিল। সুতরাং আমাদের ফিরে যেতে হবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে; বিশুদ্ধ আকীদা এবং সুস্থ চেতনার রজ্জু আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই আমরা আবার ফিরে পাব সেই সম্মান, সেই মর্যাদা—ইনশাআল্লাহ!

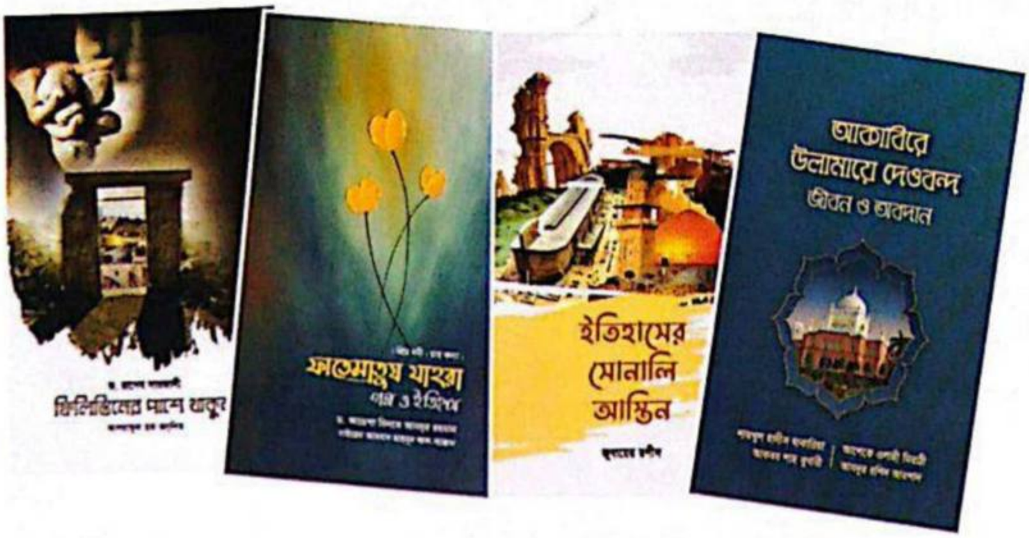
আল্লাহর কাছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য সাহায্য কামনা করছি।

ড. রাগিব সারজানি

সমাপ্ত

1. www.islamstory.com

রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ–





প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।